নির্মলকুমার
লতিফুল আলম

নির্মলকুমার

লতিফুল আলম

বর্ণমালা

Nirmalkumar

A collection of short stories by

Latiful Alam

নির্মলকুমার

ছোট গল্প সংকলন

লতিফুল আলম

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা জানুয়ারী ২০১৬

প্রকাশক ঃ বর্ণমালা

প্রচ্ছদ ঃ সৌম্যদীপ রায়

অক্ষর বিন্যাস ঃ সুমন দত্ত বণিক

মুদ্রক ঃ বর্ণমালা

৯/৪বি প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা ৬

মূল্য - ৩০ টাকা

আব্বু ও সোনা কে

সূচীপত্র

ভূমিকা

চা বাগানে সবার পরিচিত ছিলেন বল্টুবাবু নামে। চাকরিসূত্রে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বীরপাড়া এলাকার একটি চা বাগানে। লেখকের জন্ম ১৯৪৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে । বয়স যখন চোদ্দ কি পনের তখন থেকেই তিনি লেখা শুরু করেন। চা বাগানে চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর লেখালেখি বন্ধ করে দেন। পুনরায় ২০১১ সালে লেখালেখির শুরু এবং তার পর থেকেই তিনি ছোট গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখছেন। পাঁচটি ছোটগল্পের সংকলন 'নির্মলকুমার' লেখকের প্রথম প্রকাশিত বই। তাঁর গল্পের মিলি, দুলাল, আজিজুল, নগেনের বউ, নির্মল — এঁরা প্রত্যেকে হয়ত আমাদেরও খুব চেনা। এই মানুষগুলির আপাতসাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গল্পগুলির সূত্রপাত।

সোমদত্তা মুখার্জী

জানুয়ারী ২০১৬ কলকাতা

আশ্রয়

আজিজুল ছোটোবেলা থেকে কোচবিহারে। বাবার সঙ্গে দিনমজুরি কাজ করবে বলে এখানে আসে। ছোটো ছিল বলে বাবা কার কাছে রেখে আসবে, তাই সঙ্গে নিয়ে আসে। থাকার জায়গার অভাব ছিল, যখন বড়ো কোনো কাজ হত, দিনরাতের কাজ, যেখানে কাজ হত, সেখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হত। ছোটো বলে সবাই মানিয়ে নিত। আজিজুলের কাজ দেখা, টুকটাক ফরমায়েস খেটে ভালো চলে যাচ্ছিল। দিনমজুরির কাজ যারা করে, কখনও সখনও তাদের ভারি কাজ করতে হয়। এইরকম একটা ভারি কাজ করছিল আজিজুলের বাবা। লোহার পাইপ উপরে লাগানো জোগালির কাজ। মাঝে মাঝে লোহার বড়ো বড়ো বিম উপরে উঠিয়ে জোড়া লাগাতে হচ্ছে। জোড়া লাগাতে হলে মেজারমেন্ট করে জোড়া লাগাতে হয়। এই জোড়া লাগাতে গিয়ে উপর থেকে পা স্লিপ করে আজিজুলের বাবা নীচে পড়ে যায়, লোহার বিমগুলো যেখান ছিল সেখানে পড়ে যায় এবং সেখানেই মৃত্যু হয়। তারপর থেকে আজিজুল একা হয়ে যায়। একা হয়ে যাবার পর আজিজুলের চিন্তা একটা আশ্রয়ের। এমনিতে কেউ মারা গেলে তার পরিবার কিছু টাকা পায়, কম্পেনসেশনের টাকা। আজিজুলের বাবা কাজ করতে করতে মারা যায়, ঠিকাদারের তো ইচ্ছা নেই টাকা দেওয়ার। কীভাবে ফাঁকি দেবে সেই চেষ্টা করছে। অনেকে কাজ করছে, তাদেরও মনে একটা প্রশ্ন জাগবে। নিজের কাছে রেখে দিল আজিজুলকে। থাকতে থাকতে আজিজুলের উপর মায়া পড়ে গেল। একদিন সে আজিজুলকে ডেকে বলল, "আজিজুল, তুই তো বড়ো হয়ে গেছিস, এখন তো নিজে নিজে কাজ করে খেতে পারবি, আমার এখানে যে কাজ করলি, সেই বেতনের টাকাটা আমার কাছে আছে। সেই টাকা দিয়ে কোনো ফুটপাতে পান, বিড়ির দোকান দিলে চালাতে পারবি তো! নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা কর, কতদিন আর কুলিমজুরির কাজ করবি!" আজিজুল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দিল।

আজিজুল দোকানের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন সেরকম একটা জায়গা পেয়ে যায় রাস্তার উপরে, তার পাশে একটু খালি জায়গা। সেই রাস্তার উপর ছোটো একটা দোকান করল, রাতে সেখানেই শোবার ব্যবস্থা করল, ঠিকমতো শুতেও পারত না, কোনোরকমে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ত। আজিজুলের পানের দোকানে ভালোই বিক্রিবাট্টা হতে লাগল। ভালো চলছিল বলে আরও নানা জিনিসপত্র রাখতে শুরু করল। পিছনে যে জায়গাটুকু ছিল, সেখান পর্যন্ত দোকানটা বাড়িয়ে দিয়ে বিয়ে করে নিল। যাকে বিয়ে করল সেই মেয়েটার দেখাশোনার কেউ নেই। দোকানের আশেপাশের ছেলেরা, দোকানের আশেপাশে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে, গল্প করে। একদিন একজন আজিজুলকে বলে, "তোকে হয়তো উঠে যেতে

হবে। আমি শুনতে পেলাম। এখানে বড়ো অটোমোবাইলের দোকান হবে। বড়ো দোকান হবে, এই পুরো জায়গাটা ওদের ব্যবসার খাতিরে লাগবে। বড়ো দোকান থাকলে আমাদের মতো লোক তোর এখানে আড্ডা মারুক সেটাও চাবে না।"

আজিজুল বলল, "বললেই হল, আমি উঠে যাব! বিয়ে করেছি, বউ নিয়ে কোথায় যাব?"

"দেখ, ওদের সঙ্গে পেরে উঠিস কিনা।"

তাই হলো, একদিন একটা গাড়ি আজিজুলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে না নেমে গাড়ির সামনে আজিজুলকে ডেকে নিলেন এবং সামনে যাবার পর বললেন, "তুমি এই জায়গা ছেড়ে দাও, অন্য জায়গায় গিয়ে দোকান করো।"

"এই জায়গায় তো আমি অনেকদিন থেকে আছি।"

"ওই কিছু অজুহাত আমি কিছু বুঝি না।"

"এখানে অনেকদিন থেকে আছি, তার উপর আমি বিয়ে করেছি। এখন আর নতুন করে কোথায় যাব?"

ভদ্রলোক বললেন, "এই সব জায়গা আমি কিনে নিয়েছি। এখানে একটা না, অনেক কয়েকটা দোকান বাড়ি হবে। সুতরাং তোমাকে চলে যেতে হবে। তোমাকে পনেরোদিন সময় দিলাম, এর মধ্যে উঠে চলে যাবে। টাকাপয়সা লাগলে কিছু টাকা দিয়ে দেব।"

আজিজুলের পনেরোদিন কীভাবে গেল, হিসেব করেও পেল না। আজিজুলের বউ বার বার বলতে লাগল, "আমি অপয়া, আগে তুমি ভালো ছিলে, যেই আমাকে বিয়ে করলে, তোমাকে এখান থেকে উঠে যেতে হচ্ছে।"

"উঠে যেতে হবে বললেই তো হল না। আমার বউ ঘরে আছে, কেউ কিছু বলতে পারবে না। থানা, পুলিশ আছে না!"

পনেরোদিন পার হল। তারপরের রাতে কে যেন আজিজুলকে ডাকতে লাগল। আজিজুল দোকানের পাল্লা খুলতে না খুলতেই সবাই হুড়মুড় করে দোকানে ঢুকে পড়ল। সবার হাতে রড, বড়ো দা, চাকু, ছুরি, লাঠি দিয়ে সব কিছু ভাঙতে শুরু করল। ওদের ভয় দেখাতে লাগল। তাদের একজন ভালো লোক সেজে বলল, "টাকা-পয়সা যা কিছু নেওয়ার নিয়ে নাও। জামাকাপড় গুছিয়ে ভরে নাও, বিছানাটা গুছিয়ে নাও।" আর একজন বলল, "না হলে দুইজনকে মেরে বিছানা নদীতে ভাসিয়ে দেব।" সবাই মিলে দোকানটা ভাঙতে শুরু করল। আজিজুল ও আজিজুলের বউ ভয়ে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে যা কিছু নেবার ব্যাগে ও বাক্সে ভরতে লাগল। তারপর কয়েকজন মিয়ে ওদের জিনিসপত্রসহ স্টেশনে নিয়ে গেল। গৌহাটি যাওয়ার ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে হাতে গৌহাটির ট্রেনের টিকিট

দিয়ে একজন বলল, ''কামরূপে নেমে যাবি। ওখানে দোকান করা বা থাকার জায়গা পেয়ে যাবি। খবরদার এদিকে আসার চেষ্টা করবি না। এদিকে আমাদের কারও চোখে পড়ে, তাহলে তোকে বেঁচে থাকতে হবে না।'' দুইজনের এমন অবস্থা, মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হচ্ছে না। কে কী বলল কানে ঢুকল না, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ট্রেন কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাও ঠাহর করতে পারছে না। কখনও কোচবিহারের বাইরে বার হয়নি, ট্রেনেও চড়েনি, দু'হাতে টিকিট নিয়ে বসে আছে। ওরা যেখানে বসিয়ে দিয়েছে সেখানেই বসে আছে। কখন ফকিরগ্রাম, গোসাইগাঁও, নলবাড়ি পার হল টের পেল না। টিকিট চেকার এসে যখন টিকিট চাইতে লাগল, তখন সচেতন হল। পাশের লোকটা গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ''টিকিট থাকলে বাবুকে দেখাও।'' আজিজুল হাত খুলে টিকিট দেখাল। চেকার চলে যাবার পর লোকটা আজিজুলকে জিজ্ঞাসা করল, ''কী হয়েছে, কয়েকজন মানুষ তোমাদের নিয়ে এসে বসিয়ে দিল।'' আজিজুল বোধহয় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে, কিচ্ছু বলতে পারছে না। তখন আজিজুলের বউ ধীরে ধীরে সব বলে বলল, ''এখন যাই কোথায়? ওরা বলল কামরূপ নামতে। কামরূপ কোথায় তাও জানি না, কামরূপে নেমে কী করব!'' লোকটা বলল, ''এর পরের স্টেশন কামরূপ, নেমে চেরালি পাবে, তারপর পাণ্ডু। সেখানে গেলে ঠিক একটা জায়গা পেয়ে যাবে।''

কামরূপ স্টেশনে নেমে ওদের সজাগ হতে হল। আবার নতুন করে কামাই-এর রাস্তা করতে হবে। রাতভর দিনভর ঘুম হয়নি, খাওয়া হয়নি। স্টেশনে নেমে খাওয়ার কথা চিন্তা করল। আজিজুলের বউ বলল, ''এখন স্টেশনে কিছু খেয়ে নিই, একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। এখন আবার কোথায় যাব, রাতটা স্টেশনে কাটিয়ে দিই। জায়গাটা চিনি না, একদম নতুন। কাল সকালে যা হোক কিছু করা যাবে।''

সকাল হওয়ার পর আজিজুলরা বার হল, স্টেশনের চারিদিকটা ঘুরল, তারপর চেরালি এল। চেরালিতে দেখল এটা একটা জনবহুল এলাকা, এখানে জায়গা পাওয়া মুশকিল। তারপর রিক্সা নিয়ে পাণ্ডুর দিকে গেল। এখানে জায়গাটা শান্ত। আগে লোকজন ছিল, জায়গাটা খুব চালু ছিল। যখন এই ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর কোনো ব্রীজ ছিল না, আমিনগাঁও ঘাট থেকে নদীপথে পাণ্ডু এসে লোকে গৌহাটি যেত। ব্রীজ হওয়াতে পাণ্ডুর কদর কমে গেছে, তাই জায়গাটা শান্ত। এখন একটা থাকার জায়গা চাই। আজিজুল একা থাকলে হয়তো কোনোরকমে কোথাও মাথা গুঁজে পড়ে থাকত। বউ আছে, ওকে নিয়ে রাত কাটাবে, হোটেলে থাকলে অনেক টাকাপয়সা লাগে। আসামি ভাষাও বলতে পারে না। ভাষাগত সমস্যা হয়ে গেছে। একজন তো অবস্থা দেখে বলেই ফেলল, ''তোমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছ। বর্ডার পার হয়ে।'' কী আর বলবে আজিজুল, চুপ করে থাকল।

কয়েকদিন পর আবার শুনতে পেল, "আমরা বাইরের রাজ্যের কাউকে থাকতে দিবো না। আমরা নিজেরাই কাজ পাই না। তোমরা যেখান থেকে এসেছ ওখানে চলে যাও।" এমনি আসামে সবসময় আন্দোলন চলে, বোরো আন্দোলন, আসাম মুক্তি মোর্চার আন্দোলন। এই আন্দোলনের বেশিরভাগই অল্পবয়সের ছেলেরা, এদের ভয়ে সবাই ভীত। আজিজুলদের দেখেও বলে, "তোমরা এই দেশের লোক না। যেই রাজ্য থেকে এসেছ ওদেশে চলে যাও।" এই কথাটা এখন প্রায় শোনা যায়।

দুইয়ে মিলে টুকটাক যাই পায় করে এবং পাণ্ডুতে একটা ঘর পেয়ে সেখানেই থাকতে শুরু করে। একদিন একটা দোকানে চা বিস্কুট খাচ্ছিল দু'জনে মিলে, তখন যে বাসায় ভাড়া নিয়েছিল ছোটো একটা ঘর, সেই লোকটা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বলল, "তোমরা এখন পালাও। তোমাদের পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। কে যেন পুলিশে খবর দিয়েছে তোমরা বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছ।"

"আমরা কোথায় যাব এখন, কিছুই তো চিনি না। পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তো ভালোই, একটা থাকার জায়গা তো পাওয়া যাবে। একা হলে তো পালায় পুলায় থাকতাম।"

"ওইসব কথা বাদ দাও। আমার ওখানে পুলিশ রাতের বেলা আবার আসবে। তার আগে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। শোনো তোমরা এখান থেকে জলপাইগুড়ি চলে যাও। সেখানে আমার এক ভাই থাকে, তার কাছে যাও। আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিখানা তাকে দিবা। সেই ব্যবস্থা করে দিবে। আল্লা আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। একটা হিল্লা হয়ে যাবে। তোমাদের দুইজনের উপর কেমন মায়া হয়ে গেছে। আমারও ওর মতো একটা বেটি আছে। তোমরা এখনই চলে যাও। চল আমি তোমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিই।"

আজিজুল রোড স্টেশনে নেমে লোকের সঙ্গে কথা বলে বুঝলো নিয়ামতের বাড়ি অনেক দূরে। খুঁজতে বেশ সময় লেগে গেল। আজিজুল নিয়ামতের নাম মুখস্থ করে এসেছিল। চিঠি পড়ার পর নিয়ামত বলল, "আজকে এই বাইরের ঘরটায় থাকো, কাল একটা ঘর উঠিয়ে দিব, তখন ভাড়া দিও। আজ এখানেই খাওয়া করো। বিশ্রাম করো। কাল কোনও কাজের ব্যবস্থা করতে পারি কি না দেখি, কাল কথাবার্তা বলব।" পরদিন সকালে নিয়ামত বলল, "তুই টিকিট বেচাবার পারো? লটারির টিকিট?" আজিজুল মাথা নেড়ে বলল, "পারব", তারপর অবার বলল, "আমাকে পারতে হবে।"

"আমার একজন জানপয়চান, লটারির টিকিটের আড়তদার আছে। তার সঙ্গে আজ কথা বলব, আমি জিম্মাদার হয়ে টিকিট নিয়ে তোকে দিব। সেই টিকিট বিক্রয় করে টাকাটা আড়তদারকে . . . মূলটা ফিরত দিয়ে দিবি, লাভ বা কমিশনটা তুই রেখে দিবি। আজ আমি কথা বলে দেখি, কাল তোকে নিয়ে যাব।"

পরদিন থেকে আজিজুল টিকিট বিক্রির কাজে লেগে গেল। ঘাড়ে ব্যাগ' নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চিৎকার করে, "আসুন, আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করুন, একটা কিনলে আপনার ভাগ্য ঘুরে যেতে পারে।" না হলে দোকানে গিয়ে, অথবা কোনও সময় অফিসে গিয়ে টিকিট বিক্রি করতে লাগল। এই করে আজিজুলের দুই পয়সা আসতে লাগল। টিকিট যখন ভালো বিক্রি হচ্ছে, নিয়ামত বলল, "কতো ঘুরে ঘুরে টিকিট বিক্রয় করবি। তার চেয়ে দীনবাজার আর কোর্টের সামনে, টেবিল আর বেঞ্চ নিয়ে বস। একবারে ভালো জায়গা দেখে বসবি। বেশি করে টিকিট রাখবি, সবসময়ের জন্য, যেন বাসায় এসে বিক্রয় করতে পারিস। জায়গাটা তো বেশ দূর, একটা পুরোনো সাইকেলও কিনে নে।"

নিয়ামত সঙ্গে গিয়ে জায়গা দেখে দিয়েছে। সাইকেল কিনে দিয়েছে। এই এলাকায় থাকতে থাকতে নিয়ামতের অনেকের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছে, তাই টিকিট বিক্রির জায়গা পেতে অসুবিধা হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে আজিজুল ব্যবসা জমিয়ে নিয়েছে। টাকাপয়সা আসতে শুরু করেছে। নিয়ামতের সঙ্গে থাকতে থাকতে নিয়ামত আজিজুলের আপন চাচা হয়ে গেছে। আশেপাশের সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। বাসায় এসে এখন অনেকে টিকিট নিয়ে যায়। বাসার টিকিট আজিজুলের বউ বিক্রি করে। একদিন নিয়ামতের ভাস্তা এসে বলল, "চাচা, আমার জায়গাটা বিক্রি করব। শ্বশুরবাড়ির ওখানে গিয়ে থাকব। পাহাড়পুরের কাছে শ্বশুরমশাই একটা পাকা ঘর তৈরি করে দিয়েছে। মাকেও নিয়ে যাব।" তখন নিয়ামত আজিজুলকে বলল, "দ্যাখ আজিজুল, একটা জায়গা পাচ্ছিস কিনে নে।"

আজিজুল বলল, "একসঙ্গে অতো টাকা তো আমার কাছে নেই।"

"এখন যা আছে দিয়ে দে, পরে আস্তে আস্তে দিবি।" তারপর ভাস্তাকে বলল, "কি রে, রাজী তো?"

ভাস্তা বলল, "তুমি যখন আছ, চিন্তা কি!"

আজিজুলের থাকার জায়গাও হয়ে গেল। আজিজুলের রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিন টিকিট ভালোই বিক্রি হচ্ছে। একদিন আজিজুল বাড়ি ফিরেই নিয়ামতের কাছে গেল। বলল, "শুনলাম এখানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স হবে, এটা খাস জমি, আগে রাজার ছিল। স্পোর্টস কমপ্লেক্স হলে আমাদের উঠে যেতে হবে।"

নিয়ামত বলল, "খবরটাতো আমিও শুনেছি। আমরা এখান থেকে গেলে চারিদিকে যে বড়ো বাড়ি তাদেরও যেতে হবে।"

এই খবর শোনার কয়েকদিন পর, পর পর কয়দিন মাইকে অ্যানাউন্স করে গেল, "এখানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স হবে, সেইজন্য জানানো যাইতেছে, এই জায়গা ছাড়িয়া যাবেন। হাউসিং-এর পিছনে যে জায়গা খালি আছে সেখানে বসতি করিবেন।"

রাতে আজিজুলের বউ আজিজুলকে বলল, "একটা ঘর কিনা হল, এই জায়গা ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে, হায় আল্লা, আমাদের কপালে থাকবার জায়গা নেই। এখন কোথায় যাই!"

আজিজুল বলল, "থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে, শুধু এই জায়গাটা ছাড়বার লাগবে। পাহাড়পুর যাবার সময় অনেক কয়েকটা বড়ো বড়ো বাড়ি দেখতে পাইছিলে না, তার পিছনে একটা বড়ো মাঠ আছে, সেখানে আমাদের সবাইকে যেতে লাগবে। দেখি এখন এখানকার নেতারা কী বলে।"

আজিজুল দিনবাজারে টিকিট বিক্রয় করতে বসেছে। খদ্দেরও অনেক পেয়েছে। দেখে একটা বিরাট প্রসেশন রাস্তা দিয়ে হল্লা করে যাচ্ছে। প্রথমে তো লোকের লাইন, হাল্লা দেখে গায়ে লাগছিল না। এরকম তো হামেশাই দেখা যায়। তারপর যখন কানে এসে লাগল স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কথা, তখন ভালো করে দেখে শহরের ভালো ভালো লোকেরা, স্কুল কলেজের ছেলেরা, প্লেয়াররা চিৎকার করছে, "আমাদের শহরে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করতে হবে।" এত বড়ো লাইন মনে হয় শহরের সব লোক এসে জমা হয়ে গেছে। বাসায় চাচার কাছে এসে কথাগুলো বলল, অনেক রাত পর্যন্ত গল্পও করল, তারপর শুয়ে পড়ল। তখন কতো রাত বলতে পারে না, আজিজুলের ঘুম ভেঙে গেছে। চারিদিকে চিৎকার চেঁচামেচি, টিনের শব্দ, ধম্ ধম্ শব্দ। আজিজুল ঘরের দরজা খুলে বার হয়, ভালো করে লক্ষ করে, দ্যাখে মিলিটারি ও মিলিটারি গাড়িতে চারিদিক গিজগিজ। তার সঙ্গে বড়ো বড়ো বুলডোজার অনেক কয়টা বাড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। বড়ো বড়ো পুলিশ ভ্যানে সবাইকে ভরছে। চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে গেছে। ট্রাকেও মালপত্র ওঠানো হচ্ছে। আজিজুলদের দুইজনকেই একসময় ট্রাকে উঠানো হল, মালপত্রসহ। তারপর ট্রাকে করে নিয়ে এসে এক মাঠের মধ্যে ফেলে দিল, সেখানে এর আগে অনেককে নিয়ে এসে ফেলেছে। রাতে তো কিছু বোঝার উপায় নেই। ট্রাক থেকে নামিয়ে দেবার পর বলল, "ইঁহাসে কিধার ভি নাহি জায়েগা, রেহেনেকো জাগা দে দিয়া, ঘর বানাকে রহো।" বলে চলে গেল।

মিলি

নিমুভাই-এর কাছে আড্ডা মারছিলাম, নিমুভাই হঠাৎ বলল, "লতিফ, তোমাকে একটা বিয়ের সাক্ষী দিতে হবে।"

আমি বললাম, "আশ্চর্যের ব্যাপার, বিয়ে করনি, তোমার এখানে তিনকুলে কেউ নেই, আবার কে এল!"

নিমুভাই বলল, "মিলির বিয়েটার রেজিস্ট্রেশন করাব। ওদের আগেই বিয়ে হয়েছে, প্রায় বছরখানেক আগে।"

আমি বললাম, "আগে বিয়ে হয়েছে, এখন রেজিস্ট্রেশন করছ কেন?"

নিমুভাই বলল, "একবছর আগে বিয়ে হয়েছে, তখন মিলির বয়স ১৮ বৎসর, ছেলের বয়স ২০ বৎসর। সরকারের মতে মিলির বয়সটা ঠিক ছিল, কিন্তু ছেলের বয়স এক বছর কম ছিল। তাই এইবছর আমি ওদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করাতে চাই।"

আমি বললাম, "তুমি কেন, ওর বাবা মা?"

নিমুভাই বলল, "ওর বাবা মা তো চামার। মিলি ছেলেটার সঙ্গে চলে গিয়ে বিয়ে করে। ছেলের বাবা মা মিলিকে খুশি মনে গ্রহণ করে নিয়েছে।"

আমি বললাম, "তাহলে প্রবলেম কোথায়?"

নিমুভাই বলল, "মিলির শ্বশুর শাশুড়ি চেয়েছিল, বিয়েটা সামাজিক মতে অনুষ্ঠান করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মিলির বাবা মা মত দিল না, বিয়েটা মেনে নিতে পারছিল না। জামাই এসেছিল প্রণাম করতে, প্রণাম গ্রহণ করেনি।"

আমি বললাম, "বাবা মা-র কাছে না এলেই হল, মিলির শ্বশুর শাশুড়ি ভালো হলে ভালো, মিলিকে সেখানেই সারা জীবন কাটাতে হবে। ওর শ্বশুর শাশুড়ি মেনে নিয়েছে, আর কী চাই।"

নিমুভাই বলল, "যত কিছু হোক, বাবা মা-র একটা কর্তব্য আছে। আমি মনে করি মিলি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ভালো করেছে। ওর বাবা মিলিকে কোনোদিন ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পারত না। সেরকম ক্ষমতা ওর বাবার নেই। মিলি বাবা মা-র অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তো পালিয়েছে। ছোটোবেলা থেকে দেখেছি মিলি মরে যাক, ওর বাবা মা সেইটাই চেতো। মিলির বাবা এমনিতে যা কামাই করে, সংসার চালাতে পারে না, তার উপর দু'টা মেয়ে, মিলির দিদি এবং মিলি। মিলি এমনিতে মেয়ে, সেইজন্য জন্মের পর থেকে মিলিকে অবজ্ঞা করত যাতে এমনি এমনি মারা যায়।" নিমুভাই বলতে লাগল, "মিলি দূর সম্পর্কে

আমার একরকম নাতনি হয়। আমার দোকানের পিছনে আমার শোবার ঘর, তার সঙ্গে যে গায়ে লাগানো বাড়িটা, ওটাই মিলিদের। এইটাই ওদের ঠাকুরদাদার বাবার সম্পত্তি। একটা থাকার জায়গা পেয়েছে বলে বেঁচে গেছে। নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, কাজ কিছুই করে না?"

নিমুভাই বলল, "করে সামান্য কিছু, ওতে পেটের ভাতই শুধু জোগাড় হয়। নিজের দোকান নেই, একটা দোকানে দর্জির কাজ করে। দশ আনা ছয় আনার কাজ—এটা আগের দিনের হিসাব। ১০০ টাকার মধ্যে ৬০ টাকা পাবে দর্জি, বাকি ৪০ টাকা মালিকের। এতে সংসার চলবে কী করে! একদিন ভোর রাত থেকে মিলির কান্না শুনতে পাচ্ছি। মিলির তখন কত আর বয়স, মাস তিনেক কি তার চেয়ে কম। খুব কাঁদছে। আমার এখান থেকে পরিষ্কার শোনা যায়। দোকানে এসে দোকান খুললাম, তখনও কাঁদছে। নয়টা, দশটা . . . কেঁদেই চলেছে। এখান থেকে বার বার জিজ্ঞাসা করছি 'বাচ্চা কাঁদে কেন', কেউ উত্তর দেয় না। তারপর সহ্য করতে না পেরে নিজে গেলাম। গিয়ে দেখি কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলতে শুরু করেছে। চারিদিকে পেচ্ছাপের গন্ধ, পেচ্ছাপের মধ্যে শুয়ে আছে। তার দিকে কারও লক্ষ নেই। সব বড়ো মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি তারপর বললাম, 'একে এভাবে ফেলে রেখেছিস কেন, কী হয়েছে?' বাবা তো কিছু বলল না, মিলির মা এসে বলল, 'দেখনু না, সকাল থেকে কেঁদে চলেছে, কিছুতেই চুপ করছে না।' আমি বললাম, 'ডাক্তার দেখাসনি?' মেয়ের মা বলল, 'না, তবে একটু মধু খাইয়ে দিয়েছি।' আমি বললাম, 'তোরা মানুষ না কি, মেয়েটা সারাক্ষণ কেঁদেই যাচ্ছে, আর তোদের সেদিকে লক্ষ নেই, তোরা চাস মেয়েটা মরে যাক!' ওরা দু'জনের কেউ একটিও কথা বলল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর তুমি মিলিকে ডাক্তার দেখালে?"

নিমুভাই বলল, "আমি মিলিকে উঠিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে এলাম। ডাক্তারবা[illegible] ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, একে তো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, দুটো লাঙ্স-এ কফ জমে আছে, নিমুনিয়া। হাসপাতাল ছাড়া ভালো হবে না।"

নিমুভাই বলতে লাগল, "ডাক্তারবাবুকে বললাম, হাসপাতালে নিয়ে গেলে অসুবিধা আছে। ওকে দেখার কেউ নেই। যা ঔষধ লাগে আপনে লিখে দিন, আমি কিনে নিব। আমার কথামতো ডাক্তারবাবু লিখে দিলেন। আমি মিলিকে নিয়ে দোকানে শুইয়ে রাখলাম, কান্না বন্ধ হয়ে গেছে, ঘুমোচ্ছে। ঔষধ খাওয়ানোর পর একটু ভালো। ওর বাব মা এসেছিল মিলিকে নিয়ে যেতে। আমি বললাম, এখন থাক, আজ থেকে মিলির পুরো দায়িত্ব আমার।

নিমুভাই বলতে লাগল, "সেই থেকে মিলির পুরো দায়িত্ব আমি নিলাম। ঔষধ পথ্য দিয়ে মিলি ভালো হয়ে গেল। মিলির দায়িত্ব যখন নিলাম, মিলির বাড়ির সঙ্গে একটা যোগাযোগ হতে পুরো সংসারের ভার আমার গায়ে পড়ে গেল। এতদিন হোটেলে খেতাম, এখন ওদের বাড়িতে খেতে লাগলাম। মিলির বাবা এসে বাজার করার টাকা নিয়ে যেত। দুপুর রাত্রি টিফিনক্যারি করে খাবার পৌঁছে দিত। মিলিকে স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। মিলির জন্য ফল মূল কিনে দিতাম, ওর বাবা মা দিদি খেয়ে শেষ করে দিত। এইভাবে মিলি বড়ো হতে থাকে। ওর বাবাটা মহা বদমাশ। আমি বাজার করতাম মাঝে মাঝে, ওর বাবা যখন বাজার করত, সব্জির দোকানে মাছের দোকানে আমার নামে বাকি রেখে আসত। মিলি যখন ছোটো ছিল, মিলির নামে কিষাণ পত্র কিনে রেখেছিলাম। মিলির বাবা বাজার থেকে টাকা চুরি করত বা বাকি রাখত বা মিলির খাবারগুলো খেয়ে নিত, টাকা পয়সার অভাবে এরকম করত, আমি কিছু বলতাম না। এর মধ্যে দিয়ে মিলিকে বড়ো হতে হবে। তারপর যখন কিষাণ পত্র মেচিওর হয়ে ৫৪,০০০ টাকা হল, এই টাকাটা মিলির বাবার হাতে দিয়ে বললাম, মিলির নামে পোস্ট অফিসে ফিক্সড্ করে রাখার জন্য। আমি এমনভাবে কিষাণ পত্র কিনেছিলাম, সেটা যখন মেচিওর হবে, মিলিও মাধ্যমিক পাশ করবে। মিলির বাবাকে এও বলে দিলাম যে এই টাকাটা ওর বিয়ের জন্য লাগবে। তখন মিলি মাধ্যমিক পাশ করে ইলেভেনে ভর্তি হয়ে গেছে।

মিলি দোকানে আসতে আমি মিলিকে জানালাম, 'তোর বাবাকে আমি ৫৪,০০০ টাকা দিয়েছি তোর নামে পোস্ট অফিসে ফিক্সড্ করার জন্য।' এই কথাটা মিলি ওর বাবাকে বলতে বাবা বলে, 'টাকার হিসাব তুই আমার কাছে নিতে এসেছিস!' বলে নাকের মধ্যে জোরে একটা ঘুষি মারে। ওইভাবে মিলি আমার কাছে আসতে চেষ্টা করে। তারপর আবার মারে, মেরে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে। আমি অনেক পরে খবর পাই। মিলিকে দেখি ওর চোখমুখ ফুলে গেছে। তারপর থেকে ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিই। মিলির বাবা কিছুদিন পরে ওই টাকা দিয়ে বড়ো মেয়ের বিয়ে দেয়। মিলি ইলেভেনে পড়ত, তখন তার সঙ্গে বিট্টুর পরিচয় হয়। বিট্টু মামাবাড়িতে থেকে এখানে পড়ত। ওদের বাড়ি ওদলাবাড়ি, বাবা মা ওখানে, রেলওয়ে কোয়ার্টারে। বাবা ফোর্থ গ্রেড-এর লাইন ম্যান। মিলি ছেলেটাকে নিয়ে দু'একবার আমার কাছে এসেছিল, ছেলে দেখে মনে হয়েছিল ছেলেটা ভালো, সরল। তারপর যখন ওরা উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর আমার কাছে এসে বলল, 'আমরা দুই জন বিয়ে করতে চাই, তুমি অমত কোরো না।' আমি অমত করবো কী, আমার এটাই পছন্দ, কারণ ওর বাবা টাকার লোভে এমন লোকের হাতে দেবে, মিলির সারাজীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমি নিমুভাইকে বললাম, "ওরা দু'জনে তো ওদলাবাড়ি গেল, ওখানে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছে?"

নিমুভাই বলল, "হ্যাঁ, ভালো করে অনুষ্ঠান করেছিল। আমি গেছিলাম গাড়ি নিয়ে সকালবেলা, ৯টার মধ্যে। সারাদিন থেকে সন্ধ্যায় চলে আসি। এখান থেকে মেয়ের শাড়ি, সায়া, চটি, ব্লাউজ, ছেলের জন্য জামা, প্যান্ট নিয়ে গেছিলাম। ওখান গিয়ে খাট, আলমারি, লেপ, তোশক, বিছানার চাদর, বালিশ—সব কিনে দিয়েছি। ওদের সঙ্গে নিয়ে সব কিছু কিনে দিয়েছি, জামা কাপড়ও কিনে দিয়েছি। মিলির শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে বলল, 'আমাদের মেয়ে নেই, মিলি আমাদের এখানে মেয়ে হয়ে থাকবে।' মিলির শ্বশুর অবার বলল, 'ছোটো ছেলে এখনও স্কুলে পড়ে। বিট্টু এখন কিছু না করলেও আমি আমার মেয়েকে ঠিক খাওয়াতে ও পরাতে পারব। মিলি যদি আরও পড়তে চায় পড়াবো।'

নিমুভাই বলল, "আমি মিলির শ্বশুরকে বলেছিলাম, জামাই-এর বয়স ২১ বছর হলে সরকারি মতে ওদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রি করে নেওয়া ভালো। রেজিস্ট্রির যা টাকা লাগে আমি দেবো এবং আমি এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলে নিই।"

আমি বললাম, "তার মানে এখন দুইজনে সাবালক সাবালিকা হয়ে গেছে।"

নিমুভাই বলল, "শুধু সাবালক হয়নি, জামাই বাবার কাজটা পেয়েছে গত মাসে। জামাই-এর বাবা জামাইকে কাজ দেবার জন্য স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছে। এ মাসে মাস মাহিনা পেয়েছে। তার বাবার কাজটা লাইনম্যানের।"

আমি বললাম, "কিন্তু রেজিস্ট্রেশন অফিসে আগে জানতে চাইবে বার্থ সার্টিফিকেট আছে কি না। সেটা লাগবে। বয়স ঠিকমতো হল কি না, সেটা দেখবে।"

নিমুভাই বলল, "ওদের আসতে বলেছি, ওরা সব কাগজ নিয়ে আসবে। ওদের দুইজনকে উকিলের কাছে নিয়ে যাব। তারপর কবে রেজিস্ট্রেশন ডেট পড়বে তোমাকে জানাব, তুমি চলে আসবে।"

পরের দিন নিমুভাই-এর ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম, মেয়ে জামাই নিয়ে কোর্টে উকিলের কাছে নিমুভাই গিয়েছিল, যে উকিল রেজিস্ট্রেশন করে তার কাছে। কাগজপত্র, বয়সের সার্টিফিকেট দেখে উকিল বললেন, "সব ঠিক আছে। আপনারা সাতদিন পর আমার বাসায় আসুন।"

নিমুভাই বলেছিল, "আমি দশদিনের দিন রোববার আপনার বাসায় যাব। খরচ কীরকম লাগবে?"

উকিল বললেন, "ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২৫০ টাকা, সেটার আপনাদের রিসিট দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের তাড়া আছে, সেইজন্য বাড়িতে করছি, তার জন্য ২০০০ টাকা লাগবে।"

নিমুভাই বলল, "আমি পুরো পেমেন্ট করে দিলাম।"

আমাকে বলল, "তুমি কিন্তু সাড়ে দশটার মধ্যে এখানে চলে আসবে। ছেলে মা বাবা সহ গাড়ি নিয়ে আসবে, সেই গাড়িতে উঠে আমরা উকিলের বাড়ি যাব।" নিমুভাই বলল, "আর একটা জরুরী কারণে রেজিস্ট্রেশন করলাম। জামাই তো চাকরি পেয়েছে, রেজিস্ট্রেশন না হলে সরকার ঘরে ওয়াইফ বলে মেনে নেবে না, তাহলে এল.আই.সি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড পেতে অসুবিধা হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রেজিস্ট্রেশনের কথা মিলির মা বাবাকে জানাবে না?"

নিমুভাই বলল, "মিলি বিয়ের পরে বলেছিল। ওরা বলল করব করব, বলে আর করছিল না। এই রাগে মিলি আর খবর দেয়নি। প্রথম থেকে খবর দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না, এই একটা ছুটো পেয়ে গেল। তারপর আমিও না করে দিলাম। এমনিতে দেরি হয় যাচ্ছে। আমি যখন মিলির দায়িত্ব নিয়েছি, রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত।"

রোববার আমি সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। নিমুভাই ফোনে আমাকে জানিয়েছে, ওরা সাড়ে আটটার সময় রওনা হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম, ওরা সাড়ে নয়টার পর রওনা হয়েছে। পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, রাস্তায় গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছিল।

আমরা পৌঁছে গিয়ে দেখি উকিলের ওখানে ভীষণ ভিড়। আমাদের আগেও আরও চারটা ম্যারেজ পার্টি এসে গেছে। তার মধ্যে এক জোড়ার দেখলাম বিয়ে হয়নি, বয়সও দুইজনের ৩৪/৩৫ বৎসর হবে। আনুষ্ঠানিক বিয়ে হওয়ার আগে তারা রেজিস্ট্রেশন করতে চায়। তারা নিজেদের বয়স, নাম, ঠিকানা নিজেরাই লিখতে পারে। উকিল দেখলেন, সবকিছু হয়েছে। ছেলেকে বললেন, "মেয়ের হাত ধরো।" ছেলে তো লজ্জা পাচ্ছিল। যখন উকিল জোরের সঙ্গে বললেন, তখন ছেলে মেয়ের হাত ধরল। তখন উকিল বললেন, "আমি যা বলছি তাই বলো, আজ থেকে আমি বাবলির বিবাহিত জীবনের সবরকম ভার নিলাম।" ছেলে তাই বলল এবং মেয়েকেও যা বলতে বললেন, মেয়ে তাই বলল। তারপর উকিল বললেন, "এবার যাও, সুখে সংসার করো।" মিলি বা অন্যান্য যারা এসেছে, তাদের কিন্তু উকিল এরকম কোনো কথা বলতে বললেন না, কারণ তারা আগে থেকেই বিবাহিত।

তবে এর মধ্যে যারা এসেছে, সবাই কোনোরকম নামটা সই করতে পারে। নাম ঠিকানা লিখতে পারে না। যারা সাক্ষী দিতে এসেছে, তারাও কোনোরকম নাম সই করতে পারে, ঠিকানা লিখতে পারে না। মিলির শ্বশুর ও শাশুড়ি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন খাতায় শুধু সই করেছে। বাকিগুলো সব আমাকে পূরণ করতে হয়েছে। আমি নিজে আমার সাক্ষীর জায়গায় সই করলাম, নামসহ পুরো ঠিকানা লিখলাম। এক জায়গায় না, তিনটি ফর্ম অফ রেজিস্ট্রেশন খাতা। মিলির শ্বশুর শাশুড়ি শুধু সই করল, বাকি নাম ঠিকানা আমাকে লিখতে হল।

তারপর আমরা চলে এলাম। আমাকে সবাই খাবার জন্য বলছিল, আমি খেতে পারলাম না। বাইরে কোথাও আমার খাবার রেস্ট্রিকশন আছে। তাই আমি বাড়ি চলে এলাম। আসার সময়ও নিমুভাই বলতে লাগল, ‘‘এবার আমি নিশ্চিন্ত, আমার কাজ তো আমি করে দিলাম, বাকিটা মিলির ভাগ্য।’’

নগেনের বউ

আমি কয়েকবছর পর যখন কদমতলায় যাই, নগেন রাস্তার ফুটপাতের উপর ছোটো একটা বই-এর দোকান খুলে বসেছে। দুই লাইটপোস্টের মাঝখানে ছোটো দোকান, উপরে কোনো ছাদ নেই। প্যাকিং বাক্সের পিচবোর্ড দিয়ে এক পাশটা ঘেরা। সামনে কতগুলো বই সাজানো, কতগুলি কমিক্স। আমি ছেলের স্কুলের বই ওর কাছ থেকে কিনতাম, কিছু ছোটোদের পুজোর সংখ্যা ওর কাছ থেকে কিনতাম। অনেকে পুজোর সংখ্যা পড়া হয়ে গেলে দোকানে দিয়ে যেত বিক্রি করার জন্য। আমি নিমুদার দোকানে গেলে নগেন আমাকে বলত, "এবার পুজোর সংখ্যার দুটো বই এখন আছে, ছোটোদের বই, আপনে যদি নেন, আধা দামে দিয়ে দিব।"

নিমুদা বলত, "নিয়ে আয়।" নিমুদা ছবি টবি দেখার পর ছেড়ে দিত, আমাকে বলত, "ওকে টাকাটা দিয়ে দাও।" নগেন বই দু'টা সুন্দর প্যাক করে দিয়ে দিত। পাশের বই-এর দোকানগুলোর সঙ্গে ওর যোগাযোগ খুব ভালো। আমি আমার ছেলের জন্য স্কুলের বই কেনার দরকার হলে নগেনের কাছ থেকে নিই, স্কুল থেকে যে বইগুলো দেয় না। নগেনকে বললেই পাশের দোকান থেকে নিয়ে এসে দিত। ফুটপাতের উপর দোকান, সেইজন্য সব দোকানের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে থাকত। সামনের ওষুধের দোকানে কেউ না থাকলে নগেনকে বলত, "এখানে দাঁড়া তো, আমি বাথরুম থেকে আসি।" বা একটা কাগজে ওষুধের নাম লিখে বলত, "এটা ওই দোকান থেকে নিয়ে আয়।" নগেন বিনা দ্বিধায় গিয়ে নিয়ে আসত। নিমুদা বলত, "নগেন দুই পেকেট সিগারেট নিয়ে আয়", আবার বলত, "দুইটা সিঙ্গারা নিয়ে আয়"। একটা নিজে খেত, একটা নগেনকে দিত।

কোনোরকম বই বিক্রি করে নগেনের সংসার ভালো করেই চলত। বউ ছাড়া দুটি মেয়ে আছে। এতদিন ভালোই ছিল, সংসার তো চলছিল। মেয়ে দু'টা একটু বড়ো হওয়াতে তাদের স্কুলে ভর্তি করতে হবে। নগেনের ইচ্ছা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিবে। নগেনের বউ বলে, "না, আমি আমাদের মেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিবো। আমাদের বাড়ির সামনে মুন্না'স হ্যাপি হোম, সেখানেই ভর্তি করে দিবো। তাহলে যাতায়াতের গাড়ির খরচা লাগবে না, বাড়ির সামনে স্কুল।"

নগেন বলে, "গাড়ি ভাড়া লাগবে না ঠিক, কিন্তু ওই স্কুলে ভর্তি করতে অনেক টাকা লাগে। অতো টাকা আমি কোথায় পাই।"

নগেনের বউ গোঁ ধরে আছে, "আমি ওই স্কুলেই মাইলাই ভর্তি করামু, না হইলে পড়বার দিমু নাই।"

এই ঝগড়ার মধ্যে থাকতে থাকতে নগেনের প্রেসার বা অন্যান্য অসুখ অ্যাটাক করেছে, নগেন নিজে কিছু বুঝতে পারেনি। দুপুরে যখন বাড়ি যায় বাজার করে নিয়ে যায়। যাবার পথে মিউনিসিপ্যালিটির বাজার, সেখান থেকে বাজার করে নিয়ে যায়। নিমুদার এখানে এসে একদিন বলছিল ও, "কয়েকদিন থেকে মাথাটা কেমন ঝিম ধরে আছে। বউ আবার বলেছে বাচ্চাদের মুন্না'স হ্যাপি হোমে ভর্তি করবে, সেজন্য টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করছি, কিছুতেই জোগাড় করতে পারছি না। এদিকে মাথাটা চক্কর দিতে থাকে। বউকে বললে বউ বলবে 'ঢং', সেইজন্য চুপ করে থাকি।"

নিমুদা বলেছিল আমাকে, "নগেনের বউ মাঝে মাঝে দুপুরবেলা খাবার নিয়ে আসে। ওকে বলব, কেন ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তির কথা চিন্তা করছে। বেশ কয়েকদিন থেকে ওর দেখা পাচ্ছি না। হয়তো রেগে গিয়ে ভাত নিয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে।" নিমুদার সঙ্গে নগেনের বউ-এর দেখা হল না, কথা বলাও হল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিমুদার দোকানে গিয়ে শুনি, দুপুরবেলা নগেন নিমুদার কাছে এসেছিল, "নগেনের বউ বলছিল বাড়িতে চাল, বাজার কিছুই নেই। দুপুরবেলা না নিয়ে গেলে রান্না হবে না। তাই নগেন আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে যায়। বলে, মিউনিসিপ্যালিটির বাজার থেকে কিছু চাল আর আলু নিয়ে যাবে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির বাজারে গিয়ে রৌদ্রের মধ্যে ঘুরে বাজার করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন লোক ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে যায়।"

নগেন যেখানে বই বিক্রি করত, তার পাশের দোকানের কাজের ছোটো ছেলেটা এসে বলল, "নগেনদা মারা গেছে, আমি এইমাত্র হসপিটাল থেকে শুনে এলাম। নগেনদার দাদা শিলিগুড়ি থেকে চলে এসেছে। আমি যখন আসব আসব করছি, তখন পাড়ার বউরা ও নগেনদার দাদা নগেনদার বউকে ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে আসে।"

নিমুদা জিজ্ঞাসা করল, "কেন কী হয়েছিল আবার!"

ছেলেটা বলল, "যারা নিয়ে এসেছে তারা বলল, নগেনদার খবর পেয়ে দৌড় দিয়ে বাইরে আসতে গিয়ে রান্নাঘরের সামনে পেয়ারা গাছে আটকানো বাটামে ধাক্কা লেগে নগেনদার বউ পড়ে যায় এবং সামনের দাঁতগুলো ভেঙে যায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তাকেও হসপিটালে ভর্তি করতে হয়। এক ঝামেলার উপর আর এক ঝামেলা।"

আমি বললাম, "নগেনের বউ ভাবল আমি এইসবের জন্য দায়ী।"

নিমুদা বলল, "হয়তো তাই, তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। নগেনের বড়ো ভাই এসেছে। ও শিলিগুড়িতে ভালো চাকরি করে।"

সেদিন তো আর কোনো খবর পেলাম না। দিনকয়েক পরে যখন নিমুদার দোকানে যাই, জানতে পারলাম সেদিনই নগেনকে শ্মশানে নিয়ে যায়, নগেনের বউকে পরদিন ছেড়ে

দেয়। শ্রাদ্ধের কাজও ওর বড়ো ভাই করে দেয়। তারপর নগেনের বড়ো ভাই দেখল ঘরগুলো সব ভাঙাচোরা, নগেনের বউ বাচ্চা মেয়ে দুইটাকে নিয়ে থাকবে, সেগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে অর্ধেক পাকা করে দিল, যাতে থাকতে কোনো অসুবিধা না হয়। ঘর যখন ঠিক করছিল, তখন দেখে যে নগেন এল.আই.সি করেছিল। কাগজপত্র নিয়ে এল.আই.সি-র টাকার জন্য এপ্লিকেশন করে দেয় এবং সেই টাকা পাওয়ার পর নগেনের বউ-এর নামে ফিক্সড্ করে দেয়। এল.আই.সি থেকে বেশ ভালো টাকা পেয়ে এখন নগেনের বউ দোকানে বসতে লাগল। বই বিক্রি করে সংসার চালাতে হবে তো। কিন্তু বই বিক্রি করবে যে সে বিদ্যাটুকু জানা নেই, লেখাপড়া জানে না। লোকের দরকার মতো বই পাশের দোকান থেকে নিয়ে আসবে যে সেইটুকু বিদ্যা নেই। বই যখন কেউ কিনতে আসে তখন পাশের দোকানের ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে, "দ্যাখ্ তো পিকু, এই বইটার দাম কত?" পিকু এসে দাম দেখে বিক্রি করে দেয়। এভাবে পিকু কতদিন করবে, পিকুর নিজের দোকান আছে তো!

আশেপাশের সবাই তখন নগেনের বউকে বলল, "তুমি চা বানিয়ে চা বিক্রির চেষ্টা কর। আশেপাশে অফিস আছে, দোকান আছে, চলবে ভালো।" নগেনের বউ-এর অবস্থা দেখে আশেপাশের সবাই সাহায্য করতে লাগল। বেশি সাহায্য পেয়েছে বই-এর দোকানগুলো থেকে। পিকুকে সঙ্গে নিয়ে নগেনের বউ দোকান থেকে চা বানানোর জন্য একটা কেরোসিন তেলের স্টোভ, একটা বিস্কুট রাখার বোয়াম, জলের কেটলি, বালতি, গ্লাস, চা বানানোর অন্যান্য সরঞ্জাম কিনে নিল। যারা দোকানে চা খেত, প্রথম প্রথম সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেত। অন্যান্য অফিসে, দোকানে নিজে চা গ্লাসে করে পৌঁছে দিয়ে আসত। রাস্তার উপর দোকান, যারা রাস্তা দিয়ে যেত বা আশপাশের লোক, সবাই দোকানে এসে চা খেত। দুই-চার পয়সা আসতে শুরু করল। আরও বিস্কুট, বিড়ি, সিগারেট, পান রাখতে শুরু করল। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দিল, এবার আর ইংলিশ মিডিয়ামে না। নগেনের বউ-এর ধারণা এই ইংলিশ মিডিয়াম করতে করতে ওদের বাবা মারা গেছে। ও তাই এবার বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দিল। স্কুলের জামাকাপড়ও বাচ্চাদের কিনে দিল। নগেনের বউ খুব ভোরবেলা উঠে, সংসারের সবকিছু কাজ করার পর রান্না করে। নিজে খায়, বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। দুপুরে বাচ্চাদের খাবার রেখে নিজের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে মেয়েদের স্কুলের খাবার ব্যবস্থা করে দোকানে চলে আসে। মেয়েদের সকালে স্কুল, সেটাই সুবিধা। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে বাড়ি চলে যায়। আগে সামনের দাঁত ছিল না, দেখতে খারাপ লাগত। এখন দাঁত বাঁধানোর জন্য দেখতে ভালোই লাগছে। এখন পরিষ্কার জামাকাপড় পরে চলাফেরা করে, দেখতে খারাপ লাগে না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে বাজার করে ফেরে, গিয়ে আবার রান্না করতে হবে। এভাবে সবার সঙ্গে মিলেমিশে নগেনের বউ আরামে আছে।

ছবি

আমিনুর হক, ডাকনাম দুলাল, পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না, পড়াশোনায় মন নেই, সেইজন্য বার বার ফেল করে। তাই পড়াশোনা একরকম ছেড়ে দিয়েছে। ফুটবল খেলতে খুবই ভালো লাগে। বাড়ি থাকে না, সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। যারা পড়াশোনা করে না, এখন তারাই দুলালের বন্ধু। দুলাল তাদের সঙ্গে সারাদিন ঘোরে। আম হলে আম পেড়ে বেড়ায়। কেউ যদি বলে, "দুলাল কয়েকটা পেড়ে দিবি?" সঙ্গে সঙ্গে পেড়ে দেয়। এই কাজ করতে পারলে দুলাল খুবই খুশি। তরতর করে গাছে উঠে আম পেড়ে দেয়। দুলাল খুব ভালো ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারে। কখনও বড়ো মাছ ধরে। পরের দিকে মাছ ধরা ওর নেশা হয়ে গেছিল। দুলালের মা যখন মারা যায়, ওর দাদা বউদিকে বলে গেছিল, "তোরা পাগলা ছেলেটারে কিছু বলবি না। যেমন আছে তেমন থাকতে দিবি। পড়াশোনা নাই করবার চায় নাই করলো। বড়ো হইলে কোনো কাজ জোগাড় করে দিবি।" মার কথামতো ওর দাদা বউদি ওকে কিছু বলে না। মাঝে মাঝে ওর বউদি বলে, "দুলাল ঘুরে বেড়ালে চলে, কাজ কাম কিছু করতে লাগবে না!" দুলাল বলে, "করব করব, তুমি দেখে নিও।" দুলাল যখন মাছ ধরার জন্য চারা বানায়, বউদিই ওকে সবকিছু করে দেয়। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর একদিন ওর দিদি এসে বলল, "দুলাল তুই কাজ কাম কিছু করবি না!" দুলাল বলল, "করব তো, দাঁড়াও কাজটা আগে পাই তো।"

ওর দিদি বলল, "তুই চল আমার সঙ্গে।"

দুলাল বলল, "তোমার সঙ্গে গিয়ে কী করব! জামাইবাবু যা রাগী।"

দিদি বলল, "রাগী হলে কী হবে, মানুষটা ভালো। তুই চল স্টুডিওতে বসবি, ফটো তোলার কাজ শিখবি।"

দুলাল বলল, "আমি যদি যাই, বউদিকে দেখবে কে? দাদা তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে। আমি না থাকলে বউদির কষ্ট হবে।"

ওর বউদি বলল, "দুলাল যা, যখন তোর দিদি বলছে। খারাপ লাগলে কয়দিন পর চলে আসবি।"

দিদি বলল, "চল ভাই, তুই ছাড়া আমার কে আছে বল? আমি ওখানে একা থাকি, তোর জামাইবাবুকে সবসময় দোকানে থাকতে হয়। মাল দরকার হলে আনতে শিলিগুড়ি যেতে হয়। তখন স্টুডিও বন্ধ রাখতে হয়।"

দুলাল বলল, "তুমি যখন বলছ যাব, ভালো না লাগলে চলে আসব।"

দিদি বলল, "তুই চল তোর ভালো লাগবে।"

দিদি দুলালকে নিয়ে গেল। মৌলানিতে বেশ বড়ো দোকান। আশেপাশে এমন দোকান নেই। দুলালকে শুধু ফটো তোলার কাজ করতে হয় না, কাজের লোকটার কাছ থেকে ক্যামেরা খোলা, বন্ধ করা, রিপেয়ার করা, এনলার্জ করা শিখতে হয়। এমনকি লোকের সঙ্গে সবসময় হেসে হেসে কথা বলতে হয়। জামাইবাবু বলে, "কাস্টমার হচ্ছে লক্ষ্মী, সেইজন্য কাস্টমারের সঙ্গে সবসময় সুন্দর ব্যবহার করবে। প্রয়োজনীয় জিনিস দোকান থেকে না কিনলেও সবকিছু প্রশ্নের উত্তর ঠাণ্ডা মাথায় দিবে।"

দুলাল এখন কাজের মধ্যে ঢুকে গেছে। কাজপাগলা হয়ে গেছে। স্টুডিও ছাড়া ও কিছু বুঝে না। খাবার সময় বাসায় এলে ওর দিদি বলত, "খেতে এলি, খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করে যা। তোর জামাইবাবু তো দোকানে আছে।"

দুলাল বলে, "বেশি ভিড় হলে জামাইবাবু সামলাতে পারবে না।"

দুলাল সবসময় কাজের মধ্যে থাকে। সুতরাং ওর টাকা পয়সা দরকার হয় না। রবিবার মৌলানি বাজার বন্ধ থাকে, স্টুডিও বন্ধ থাকে, সেই একদিন ছুটি থাকে। সেইজন্য জামাইবাবু প্রতি শনিবার দুলালকে কুড়ি টাকা করে দিয়ে থাকে, শনিবার সন্ধ্যার পর। এই কুড়ি টাকা দেয় দুলালের রবিবার একটু আনন্দ করার জন্য। টাকা পাওয়ায় বন্ধুর সঙ্গে থেকে দু'একটা সিগারেট খাওয়াও শিখেছে। চা দোকানে চা, মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খাওয়া শিখেছে। এইটুকুই, এর বেশি কিছু না। রবিবার ছাড়া অন্যদিন সময় পায় না। ক্যামেরার কাজটা খুবই ভালো শিখে গেছে। খুলা, বন্ধ করা সব কিছু নখদর্পণে।

জামাইবাবু একদিন দিদিকে বলছে, "দুলাল এত সুন্দর কাজ শিখেছে, কর্মচারীটা অনেক দিনের, তার চেয়ে ভালো কাজ করে।"

দিদি বলল, "ওকে নিয়ে তুমি আর একটা দোকান কর।"

জামাইবাবু বলল, "কোথায় দোকান দিব ? ওকে একা ছাড়তে ভরসা পাচ্ছি না।"

দিদি বলল, "দায়িত্ব পেলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম হয়তো লাভ হবে না, লস হবে। পরে ধীরে ধীরে দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। একমাত্র পড়াশোনায় ও একটু খারাপ। ছোটোবেলায় দেখেছি, একটা খেলনা গাড়ি পেলে ওটা আগে খুলবে, তারপর লাগাবে, তারপর চালাবে। ওকে একটা স্টুডিও খুলে দাও, ঠিক পারবে।"

দুলালের দিদি, দুলাল যখন ভাত খেতে এসেছে, ভাত খাবার সময় বলল, "তোকে তোর জামাইবাবু একটা দোকান খুলে দিবে। চালাতে পারবি ?"

দুলাল বলল, "চালাতে পারব না কেন ? তবে টাকা পয়সার হিসাব করতে পারব না। টাকার হিসাব করতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যায়।"

দিদি বলল, "দেখি কোথায় খোলা যায় !"

এরপর জামাইবাবু বান্দাপানি ব্যারাকের কাছে একটা স্টুডিও খুলে দেয় এবং দুলাল সেখানে বসতে থাকে। দুলাল সবসময় যে স্টুডিওতে বসে ছবি তোলে তা নয়। লোকে ডাকলে তার বাড়ি গিয়ে ছবি তুলে দিয়ে আসে। কারও বাড়িতে যদি বিয়ে হয়, বিয়ের ছবি তোলার জন্য দুলালকে ডাকা হয়। জন্মদিন, অন্নপ্রাশন—সব জায়গায় ফটো তুলতে দুলালকে ডাকা হয়। এমনকি ব্যারাকের ভিতর ফটো তোলা হলে, তাদের কোনো পার্টি হলে, সেখানে দুলালের ডাক পড়ে। ব্যারাকে সবার যাওয়া মানা, কিন্তু দুলালের সবার সঙ্গে এমন সম্বন্ধ, ওকে কেউ আটকায় না। অনেক বড়ো বড়ো অফিসারের বাংলোয় তাকে যেতে হয় ছবি উঠাতে। ব্যারাকের একজন লোক হয়ে গেছে সে। এমনকি দুপুরবেলা ব্যারাক থেকে দুলালের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। যখন দুপুরে লঙ্গরখানায় সবাই লাইন দিয়ে খাবারের জন্য দাঁড়ায়, দুলালও দাঁড়িয়ে পড়ে। যে খাবার দিতে থাকে, সে হয়তো বলল, ‘‘আমি তোমার স্টুডিওতে যাব। আমার একটা ফটো তুলবে। তুমি তো খালি সাহেবদের, সাহেবদের বাচ্চাদের ছবি উঠাও।’’

দুলাল বলল, ‘‘তুমি সব সময় আমার স্টুডিওতে যাও, বললেই ছবি তুলে দিব।’’

‘‘ঠিক আছে, কালকে তুলব’’ বলে ওকে বেশি বেশি খাবার দেয়। পরদিন ছবি তুলল কিংবা তুলল না, কিন্তু সবার সঙ্গে দুলালের খাতির।

একদিন এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো সাহেব একটা ক্যামেরা নিয়ে দুলালের দোকানে আসেন। দুলালকে ক্যামেরা দিয়ে বললেন, ‘‘দেখ তো, এটা খুলতে পারো কি না?’’ দুলাল দেখল খুব দামি জাপানি ক্যামেরা। অফিসার আবার বললেন, ‘‘সব দোকানে গেলাম, কেউ খুলতে পারেনি। সবাই তোমার দোকানের কথা বলল।’’ দুলাল অনেক কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্যামেরাটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ওপেনিং এবং ক্লোসিং সিস্টেমটা জেনে গেল এবং সাহেবকে ভালো করে বুঝিয়ে দিল। সাহেব তখন বলল, ‘‘বাকি দোকান কোনো কাজের না, সবগুলো আমি উঠিয়ে দিব।’’

সাহেব সেই ক্যামেরায় ফটো উঠিয়ে দুলালের দোকান থেকে এনলার্জ করে নিয়েছেন। তারপর যে কোনো পার্টি বা অকেশনে দুলালের ডাক পড়ে। ব্যারাকের মধ্যে দুলালের খাতির বেড়ে গেল। বড়ো সাহেবের যখনই দরকার হয় গাড়ি পাঠিয়ে দুলালকে ডেকে নিয়ে আসে, আবার গাড়ি করে পৌঁছে দেয়। বড়ো পার্টি হলে বাজনদার আসে, তাদের পাশে মাঝে মাঝে দুলালকে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক সাজানো থাকে। বড়ো অফিসার কখনও সখনও ড্রিঙ্ক অফার করে থাকে, সঙ্গে একটা বাটিতে মাংস। দু'পিস বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো, একটা সিদ্ধ পিঁয়াজ। ড্রিঙ্ক-এর গ্লাসগুলো যেভাবে সাজানো থাকে, মাংসের বাটিগুলোও সেভাবে সাজানো থাকে, দুই টুকরো মাংস একটা সিদ্ধ পিঁয়াজ। খাবার

ইচ্ছে না থাকলেও যখন অফার করে, অফিসারের কথা অমান্য করা যায় না। দুলালকে তখন একটু আধটু ড্রিঙ্ক করতে হয়।

দুলালের একটা গুণ ছিল, অফিসার যখন ডাকত দুলাল চলে আসত। বড়ো সাহেবের ছেলের জন্মদিন। বড়ো সাহেব নিচুতলার এক অফিসারকে বললেন, "ড্রাইভারকে বলে দুলাল ফটোগ্রাফিকে নিয়ে এসো। আমার ছেলের জন্মদিন, আমার ছেলের কয়েকটা ছবি তুলবে।" ও ড্রাইভারকে বলল, "তুমি গাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠিক ছয়টার সময় ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আসবে। সাহেবের ছেলের জন্মদিন।" সাহেবের কথামতো ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে দুলালকে ডেকে নিয়ে এল। দুলাল হাতে করে একটা ছোটো ক্যামেরা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। দুলালের হাতে ছোটো ক্যামেরা দেখে এই অফিসার গরম হয়ে মুখ খিস্তি দিয়ে বলতে লাগল, "এত বড়ো পার্টি, সাহেবের ছেলের জন্মদিন, এত বড়ো সাহেবের বাসায় তুমি এইটুকু ক্যামেরা নিয়ে এসেছ!" বলে গালাগাল দিতে লাগল।

দুলাল বলল, "ছোটো ক্যামেরা হলেও অনেক ছবি তোলা যায় এবং বড়ো করা যায়।"

ছোটো অফিসার বলল, "তুমি ভেবেছ আমি ক্যামেরার কাজ জানি না! কীভাবে ছবি তুলতে হয় জানি না!" বলে খারাপ খারাপ ভাষায় গালি দিতে লাগল।

দুলাল বলল, "ঠিক আছে, আমি চললাম। তোমার গালি আমি শুনতে পারব না। আমি চললাম।" বলে দুলাল হেঁটে হেঁটেই স্টুডিওতে চলে এল। এদিকে বড়ো সাহেব দুলালকে খুঁজতে লাগল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, "দুলালকে ডাকো নি?"

ড্রাইভার বলল, "ও এসেছিল। নায়েক সাহেব গালি দিয়েছে, গালি শুনে চলে গেছে।"

বড়ো সাহেব ড্রাইভারকে বললেন, "আর একজনকে ডেকে নিয়ে আস।"

ছেলের জন্মদিন ভালো ভাবে পালন হয়ে যাবার পর, পরদিন বড়ো সাহেব ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন। ড্রাইভার এক এক করে সব বলল। আবার এও বলল, "খুব খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছে।" বড়ো সাহেব বললেন, "যাও, দুলালকে ডেকে নিয়ে এসো।" গাড়িতে করে দুলাল চলে এল। সাহেব দুলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল আসনি কেন? তোমাকে ডেকেছিলাম।" দুলাল চুপ করে ছিল। "তুমি যদি এসেই থাকো, কম করে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেই পারতে।" তবু দুলাল চুপ করে ছিল। বড়ো সাহেব বলতে লাগলেন, "তোমার ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে বলো, তুমি এসে কেন চলে গেছিলে!" অনেক করে বলার পর দুলাল বলেছিল, "আমায় গালি দিয়েছে, আমি গালি সহ্য করতে পারি না।" তারপর এক এক করে সব কথা বলল। বড়ো সাহেব নায়েককে ডেকে পাঠালেন। আসার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি দুলালকে গালি দিয়েছ! একজন সিভিলিয়ানকে তুমি কেন গালি দিয়েছ?" বলে বড়ো সাহেব ফোন উঠিয়ে পুলিশকে ডেকে পাঠালেন। পুলিশ আসার পর বললেন, "একে নিয়ে

যাও, আমি পরে আসছি।" বলে সাহেব ভিতরে চলে গেলেন। নায়েককে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, নায়েক দুলালকে বলল, "আমি দুই মাস পর ঘুরে আসব। তখন তোমাকে গুলি করে মারব আর তোমার দোকান ভেঙে ফেলব। আমার নামে তুমি সাহেবকে নালিশ করলে!"

নায়েকের কথা শুনে দুলালের ভয় হয়েছিল। কিন্তু ভয় টয় সব চলে গেল যখন শুনতে পেল ওর বউদি মারা গেছে। বউদি অসুস্থ হওয়ায় জামাইবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল দুলালকে খবর দেবার জন্য। কিন্তু জামাইবাবু খবর দেয়নি। এদিকে দুলালের বউদি বারবার দুলালকে দেখতে চাইছিল, দেখতে না পেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দুলালের দাদা বলছে, "আমি একা তোর বউদিকে ছেড়ে কী করে আসি। আমি দিদিকে খবর দিলাম, জামাইবাবুকে খবর দিলাম তোকে খবর দেবার জন্য। তোর আশায় বসে থাকতে থাকতে আজই সকালে মারা গেছে। একজনকে বসিয়ে আমি নিজে এলাম তোকে খবর দিতে।" বউদির কথা শুনে দুলাল পাগলের মতো হয়ে গেছে, কী করবে তার মাথায় আসছে না। ও ওর দাদার পিছনে পিছনে চুপচাপ বাড়ি এল, বউদির শেষক্রিয়া করল। করার পর দিদি, জামাইবাবুর কাছে গিয়ে বলল, "এই যে তোমাদের বান্দাপানি দোকানের চাবি। আমি তোমাদের এখানে থাকব না।"

দিদি বলল, ' কেন থাকবি না? থাক, বাড়িতে গিয়ে কী করবি?"

দুলাল বলল, "যে বউদির জন্য আমি আসতে চাইছিলাম না, সেই বউদির অসুখের খবর তোমরা আমাকে দাওনি। আবার বল আমি এখানে থাকব! না থাকব না। তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। এই যে চলে যাচ্ছি, আর কোনোদিন আসব না।"

দিদি বলল, "লক্ষ্মী ভাইটি যাবি না, আমার দিব্যি লাগে।"

তবু দুলাল মানতে চায় না।

দিদি বলল, "তুই চলে গেলে আমার মরা মুখ দেখবি।"

দুলাল বলল, "তুমি মরে গেলে তো ভালোই হয়। তোমার জন্য বউদির মরা মুখটা দেখতে হল।"

বলে দুলাল ওখান থেকে চলে এল। আর কোনোদিন দিদির ওখানে যায়নি। দিদির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করে এসেছে। তাই বলে দুলাল বসে থাকেনি। নির্মলবাবু অ্যাডভার্টাইজ দিয়েছিল একজন লোকের জন্য। দুলাল নির্মলবাবুর দোকানে গিয়ে উপস্থিত। দুলালের সঙ্গে কথা বলে তার অভিজ্ঞতা দেখে বললেন, "তোমার তো ক্যামেরা, ফটোতে ভালো জ্ঞান। আমার এখানে থাকতে পার নিজের মতো করে, কিন্তু বেশি টাকা দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই। তোমার যা অভিজ্ঞতা, ভালো দোকানে অনেক টাকা পাবে। আমি তোমাকে সপ্তাহে আপাতত ৩০০ টাকা দিব। তুমি রাজি হলে এখানেই থেকে যেতে পার।"

তারপর থেকে দুলাল নির্মলের ওখানেই থেকে গেল।

নির্মল কুমার

নির্মল যখন মারা যায় তখন রোববারের রাত্রি বারোটা কিংবা সাড়ে বারোটা হবে, ২৩শে জুন, ২০১৩। ডাক্তারের মতামতে কিন্তু ডেথ্ সার্টিফিকেট লেখা হল ২৪শে জুন, ২০১৩। সকালে যখন নির্মলের দোকানের কর্মচারী দোকান খুলবে বলে এসে নির্মল পিছনের ঘরে যেখানে শোয় সেখানে দোকানের দাবি নিতে যায়, নির্মলের ঘরের দরজা এমনিতে সেই সময়টা খোলা থাকে, দোকানের চাবি নেবার জন্য দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখে নির্মল মেঝেতে পড়ে আছে, চারিদিকে পাতলা পায়খানার ছড়াছড়ি। গায়ে শুধু উপরে একটা গেঞ্জি, নীচে কিছু নেই। নির্মলের কর্মচারী গোবিন্দ নির্মলকে একটু ধরে ভেবেছে বিছানায় উঠিয়ে দেবে। এই ভেবে নির্মলকে ধরেছে, তখন দেখে শরীর শক্ত হয়ে গেছে। সে নির্মলকে পরিষ্কার করে বিছানায় শুইয়ে দিল। গায়ে লাগানো ঘরের সঙ্গে কুয়ো আছে, সেটা থেকে জল নিয়ে ঘরও পরিষ্কার করে দিল। নির্মলকে ধুতি পেঁচিয়ে দিল এবং গেঞ্জি পরিয়ে শুইয়ে রাখল। তারপর আশেপাশের ও ভাড়াটিয়া দোকানদারদের খবর দিল।

আমি যখন খবর পাই, তখন সাড়ে এগারোটা। আবার বন্ধু পান্ত মোবাইলে খবর দিল, "নির্মল মারা গেছে। তুই কি খবর পেয়েছিস? বেনু নির্মলের দোকানের সামনে ভিড় দেখে জিজ্ঞাসা করছিল কী হয়েছে? ওরা বলল নির্মল মারা গেছে। বেনু দেখেও এল। তুই তো ওখানেই আড্ডা মারিস।"

"না আমি কোনো খবর পাইনি।"

"গোবিন্দর তোকে খবর দেওয়া উচিৎ ছিল।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলাম, কারণ রাত ৯-৩০ পর্যন্ত নির্মলকে আমি দেখেছি। ভিতরে ঘরের মধ্যে ছিল, দোকানে ছিল না। রোববার দিন দোকান খোলে না। একটা পাল্লা খোলা রাখে, আমার জন্য, দুইজনে গল্প করি। সন্ধ্যা সাতটার সময় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি নির্মল দোকান খুলবি না?"

নির্মল বলল, "না খুলতে পারব না, বসতে পারব না। খুবই পায়খানা হচ্ছে।"

"ওষুধ খাসনি?"

"খেয়েছি, শংকর দিয়েছে। তুই শংকরকে গিয়ে বল হেচ্‌কি বন্ধ হয়েছে। পায়খানা বন্ধ হয়নি।"

আমি দোকানে গিয়ে শংকরকে বললাম। শংকর ওষুধ দিয়ে অলোকেশকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি শংকরের ওখানে বসে যাই। প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত ছিলাম। তারপর বাড়ি চলে আসি।

পরদিন দুপুরবেলা পান্তু ফোনে জানাল, নির্মল মারা গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই কি করে জানলি, আমি কালকেই কথা বলে এলাম!"

"বেনু বলল, বেনু ওদিক দিয়ে আড্ডাখানায় আসছিল। দেখে নির্মলের দোকানে ভিড় এবং দোকান বন্ধ। বেনু জিজ্ঞাসা করল, 'এতো ভিড় কেন, কী হয়েছে, দোকান বন্ধ কেন?' গোবিন্দ বলল, 'কাল রাতে নির্মল মারা গেছে। কী হয়েছে না হয়েছে বলতে পারবে না'।"

পান্তুর কাছ থেকে নির্মলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি গেলাম নির্মলকে দেখতে। কারণ আমি সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দেড় নির্মলের ওখানে থাকতাম। অনেকে মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা একটু সময় কাটাত, তার মধ্যে আমি একজন। মারা যাওয়াতে আমি আশ্চর্য হয়েছি। আমি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত নির্মলের উল্টোদিকের দোকানে বসেছিলাম। তখন বেশি লোকজন ছিল না। ভাড়াটের দু'টো দোকানই খোলা ছিল। তাদের দোকান যখন বন্ধ হয়, তারা তাদের মালপত্র নির্মলের শোবার ঘরের পাশের ঘরে রাখে। যখন দোকান বন্ধ করে তখন সাড়ে দশটা বা এগারোটা হবে। তারা খবর নেয়নি! তারা তো সন্ধ্যা থেকে জানতে পারছে, নির্মলের ল্যুসমোশান হচ্ছে।

যা হোক, আমি গিয়ে দেখলাম বেশ ভিড়। গোবিন্দ সবার সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে দেখলাম নির্মলের দোকান ও বাড়ির চাবি। গোবিন্দর মনোভাব দেখে মনে হল চাবি হাতছাড়া করবে না। বলল, "ডাক্তারের কাছ থেকে ডেথ্ সার্টিফিকেট না পেলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমরা সবাই মিলে ডাক্তারকে বলেছি, ডাক্তার বললেন তিনটের সময় হস্‌পিটাল থেকে ফিরে এসে ডেথ্ সার্টিফিকেট দেবেন।"

নির্মলের আপন বলতে কেউ নেই। গোবিন্দ নির্মলের দোকানের কর্মচারী। তার বাড়ি থেকে দুই বেলা টিফিন ক্যারিতে করে খাবার আসে। চা ও জলখাবার দোকান থেকে কিনে খায়। নির্মলের আপন বলতে চারটে মতো বিড়াল ছিল, তাদের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হোটেল থেকে রান্না মাছ ও ভাত নিয়ে আসত। শুধু বিড়ালকে খাবার দেবার জন্য এই বিড়ালের খাবার ভাড়াটিয়া দোকানদারের ছেলেরা নিয়ে এসে দিত। এই ভাড়াটিয়া দোকানের মালিক দুইজন নির্মলকে খুবই ভক্তি করত, শ্রদ্ধা করত। তারাই একটু আধটু নির্মলের সেবা করত। কারণ নির্মলের জন্য আজকে তারা দোকানদার হয়ে বসেছে।

দুই দোকানদার আবার দুই ভাই, নামও বেশ সুন্দর, গৌর ও নিতাই। নির্মলের দোকানের সঙ্গে লাগোয়া একটা দোকান সম্পর্কে নির্মল বলছিল, "অনেক কয়েক মাস হল এই দোকানের ভাড়া আমি পাচ্ছি না। দোকানটা চলে না তো ভাড়া দেবে কোথা থেকে! ওযুধের দোকান, ওযুধ ঠিকমতো রাখলে তো চলবে! লোকে ওযুধ কিনতে আসে, এসে ঘুরে যায়, ওযুধ পায় না। দোকানে ওযুধই বা থাকবে কোথা থেকে, যারা ওযুধ সাপ্লাই দেয়

তাদের টাকা দেয় না, পাওনা টাকা না পেলে হোলসেলার আবার ওষুধ সাপ্লাই করবে কেন! সেইজন্য দোকানে কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না।

আমি ওকে বলেছি দোকানটা ছেড়ে দিতে। কিন্তু ছেড়ে দিয়েই বা যাবে কোথায়! বউয়ের সঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ঝগড়া হয়। বউ চাকরি করে, স্কুলের মাস্টার। মেয়েকে নিয়ে আলাদা হতে চায়।"

"আলাদা হলে ছেলেটা খাবে কী, দোকানে বিক্রিবাট্টা নেই!"

"আমাকে বলেছে, 'এই দোকানের জন্য যে সেলামি রেখেছি, সেটা ফেরৎ পেলে ব্যাঙ্কে রেখে দিব, তারপর দুই একটা টিউশনি করে নিব।' ইংরাজির ছাত্র পড়াতে পারবে। ইংলিশে ভালো জ্ঞান আছে।

দোকানটা করার আগে সেলামির টাকা দিয়েছিল আমার বড়ো ভাইয়ের কাছে। বড়ো ভাই তো নেই। মারা গেছে। এখন আমি কোথা থেকে সেই টাকা ফেরৎ দেব, আমার হাতে তো কোনো টাকা নেই।"

"মাসখানিক ধরে দেখছি দোকানটা বন্ধ।"

একদিন নির্মলের ওখানে দেখি, গৌর দোকানটা খুলে পরিষ্কার করছে। নির্মলের ওখানে গিয়ে বসলাম, মুখে কিছু বললাম না। নির্মল নিজেই বলল, "আমার কাছে তো টাকা নেই। গৌরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওকে দিলাম। তার বদলে গৌরকে ভাড়া বাবদ দিলাম দোকানটা।"

"গৌর যে রাস্তার ওপর দোকান করে, সেটা কি উঠিয়ে দেবে?"

"না উঠাবে না, কারণ রাস্তার উপর দোকানটা ভালো চলে। ওটা দোকান না তো, হকার। সকালবেলা এসে মালপত্র জমা করে সাজিয়ে রাখে, রাস্তা দিয়ে লোকজন যায়, এমন সব প্রয়োজনীয় জিনিস সাজিয়ে রাখে যে লোকজনের চোখে পড়ে ও কিনে নেয়। সন্ধ্যার পর আবার জিনিসপত্র বড়ো বস্তা ও ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে আমার গুদাম ঘরে রেখে দেয়। এই করে গৌর তার দোকান চালায়।"

"মনে হয় এই দোকানটা হওয়াতে গৌরের সুবিধা হয়েছে..."

"হবে না কেন, তা তো হয়েছে। নিজের ছেলে দুইটাকে দোকানে বসাবে, নিজে ফুটপাতে দোকান করবে। আমি এটা যদি গৌরকে না দিতাম, অন্য লোককে দিলে অনেক বেশি সেলামি পেতে পারতাম। জলপাইগুড়ি শহরে মেইন রাস্তার উপর দোকান, পাওয়া কম কথা নাকি!"

"গৌর, নিতাই বাংলাদেশের। গণ্ডগোলের সময় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসে। তখন গৌর ও নিতাই ছোটো ছিল, কিভাবে পার হয়েছে জানি না। তবে নিতাইয়ের কাছে শুনি,

বর্ডার পার হয়ে আসার সময় নিতাইয়ের মা নিতাইয়ের দাদা গৌরকে একটু সোনা দিয়েছিল, বলেছিল, 'এটা মুখের মধ্যে রাখ, গিলে খাবি না। বর্ডার পার হলে তোর কাছ থেকে নিব।' গৌর তো সোনার নুড়িটা মুখে রেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু বর্ডারে পুলিশ দেখার পর ভয়ে সোনার নুড়িটা গিলে খেয়ে ফেলেছে। বর্ডার পার হওয়ার পর ওর মা যখন সোনার নুড়িটা চাচ্ছে, গৌর বলল পেটের মধ্যে চলে গেছে। গৌরের মা ও বাবা গৌরকে জোর করে কতবার পায়খানা করালো, কিন্তু সোনা আর খুঁজে পেল না। তবে গৌরের বা গৌরের বউয়ের মনের জোর খুবই বেশি। এই হকারি করে ছেলে ও মেয়েদের লেখাপড়া শিখাচ্ছে।"

নির্মল যখন কথা বলে, বলতেই থাকে, মাপজোক কিছু থাকে না। বোঝা খুবই কষ্টকর। পিছনের কথা আগে, আগের কথা পিছনে। কখনো কথা কম বলে, আবার বলতে থাকলে থামে না।

নির্মল যে দোকানে বসে সেটা নির্মলের স্টুডিও। নিজের বাবার আমলের বাড়ির উপর দোকান করে বসেছে। দোকানটাও নিজের নামে করেছে। বলে, "আমি নগেনদাকে চ্যালেঞ্জ করে দোকানটা দিয়েছি। বলে কি না আমার এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেলে তুই না খেয়ে মরবি। আমি নগেনদার দোকানে অনেকদিন কাজ করেছিলাম। এমনভাবে কাজ করতাম, সবাই জানত নগেনদার দোকানের মালিক আমি। নগেনদার ফটোর দোকানের সব কাজ আমায় করতে হত। বিয়ের অনুষ্ঠানে বা কোনো ফাংশানে আমাকে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে যেতে হত। নগেনদা কোথাও যেত না। এমনকি ক্যামেরাও রিপেয়ার করতে জানতাম। তখন শহরে স্টুডিওর সংখ্যা কম ছিল। সেইজন্য আমার কদর খুব ছিল এবং কাজও খুব হত। তাই আমি নগেনদাকে বললাম, আমার বেতন বাড়াতে। কিন্তু নগেনদা রাজি হচ্ছিল না, বার বার বলার পরও নগেনদা আমার বেতন বাড়াতে রাজি হচ্ছিল না। তখন আমি নগেনদাকে বললাম, আমার বেতন না বাড়ালে কাজ ছেড়ে দিব, কাল থেকে আর কাজে আসব না। নগেনদা ভেবেছে আমি আর কোথায় যাব, আবার আমাকে নগেনদার কাছে আসতে হবে। নগেনদা জানে আমি লেখাপড়ায় স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারিনি, কে আমাকে অন্য কোনো কাজ দেবে। নগেনদার ওখানে আমাকে যেতেই হবে। আমারও জিদ চেপে বসেছে। আমি নগেনদার ওখানে কাজ করব না যতক্ষণ আমার বেতন না বাড়ায়।

কয়েক মাস পর আমার বড়ো ভাই বলল, 'তোকে আমি আর বাসায় খাওয়াতে পারব না।' এই সময়টা আমার খুবই কষ্টে কেটেছে। এখানে আমরা দুই ভাই থাকি। দাদা বড়ো বলে দাদার অধিকার বেশি, সবসময় দাদাগিরি ফলায়। এই দোকানটা করতে কি কম ঝামেলা করেছে।"

"তোমার নগেনদা তোমাকে পরে আর ডাকেনি দোকানে কাজের জন্য?"

"ডাকেনি এই জন্য, নগেনদা ভেবেছিল, আমি নিজে যাব। বাবা মারা যাবার পর আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছিল।"

"তার মানে তুমি অনেকদিন নগেনদার ওখানে কাজ করেছ।"

"আমার নগেনদার দোকানে ছবি তোলার হাতে খড়ি। নগেনদা নিজে হাতে আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে ছবি উঠাতে হয়, কীভাবে ছবি এনলার্জ করতে হয়। ক্যামেরা ধরা, খোলা, রিল ভরা সব কিছু শিখিয়েছে।"

"এগুলো শিখতে তো সময় লেগেছে। কীভাবে তোমার নগেনদার সঙ্গে পরিচয় হল?"

"স্টুডিওর কাজ শিখতে অনেক সময় লাগে। আমাদের বাড়ির সামনেই দোকান। প্রথম যখন দোকানটা খোলে তখন কাজের জন্য একটা ছেলের দরকার হয়ে পড়ে, আমার বাড়ি সামনে বলে আমাকে নিয়ে নেয়। সেই থেকে নগেনদার ওখানে কাজ করছিলাম।"

"এতদিনের পুরোনো নগেনদাকে ছেড়ে চলে এলে!"

"চলে এলাম, তখন মাথায় কেন যেন একটা জিদ চেপে বসেছিল।"

"আমার মনে হয় একদিক দিয়ে ভালোই হল, তুমি এই দোকানটা করতে পারলে।"

"নগেনদার ওখান থেকে চলে আসার পর আমার যে কি কষ্টে দিন গেছে, যারা তখন দেখেছে তারা বুঝেছে। আমার বড়ো ভাই নগেনদার ওখান থেকে চলে আসার পর বলল, 'আমি তোকে আর বসায় বসায় খাওয়াব না।' দাদার আর দোষ কি! ঠিকাদারি করে যা ছোটো ছোটো কাজ পায়, সেটাতে নিজের খাওয়া ও মদ খাওয়াতে শেষ হয়ে যায়।"

"তোমার মতো তোমার দাদাও বিয়ে করেনি?"

"সময় পায়নি। মা, বোনকে দেখতে দেখতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। বাবা এই বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। আমি আর কী টাকা কামাই করতে পারতাম, যা পেতাম আমার নিজের চলত না।"

"তোমার দাদা যখন বলল খাওয়াতে পারবে না, তখন তুমি কী করলে?"

"আমি ভালো মাছ ধরতে পারতাম, সেটাকে কাজে লাগালাম। প্রথম দিকে খুব অসুবিধা হত। যার সঙ্গে মাছ ধরতাম মাঝে তার সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাকে সব কথা বললাম। সে বলল, 'তুই চিন্তা করছিস কেন, তুই আমার এখানে খাবি। আর দুইজনে মাছ ধরব। করলা নদীতে কি মাছের অভাব! এক এক জন তিনটে করে মাছ ধরার ছিপ নিয়ে যাব। একটা বড়ো মাছ ধরার, একটা একটু ছোটো মাছ ধরার আর একটা একেবারে ছোটো মাছ ধরার। যা মাছ পাওয়া যাবে খেয়েও তোর টাকা পয়সা বেঁচে যাবে। বিক্রির দায়িত্ব আমার'।"

"তা তুমি ঠিক মতো মাছ পেতে?"

"মাছ আমরা পেতাম। জল দেখে ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমি বুঝতে পেরে গেছি নদীর কোন জায়গাটায় বেশি মাছ আছে। মাছের জন্য আবার টোপ ও মাছের চারা জোগাড় করতে হত। ছোটো মাছ ধরার জন্য একটা ছোটো ছিপ নিতাম, ভাতের লেই দিয়ে পুঁটি মাছ ধরতাম, তার বড়শি একেবারে ছোটো। আর কই, মাগুর, শিঙি, ফলি, শোল ও অন্যান্য মাছ ধরার জন্য আর একটু বড়ো বড়শিসহ ছিপটাও একটু বড়ো হত। এদের চারা নিয়ে একটু সমস্যা আছে। পিঁপড়ার ডিম পেলে তো কথা নেই। বোলতার টোপও ভালো হয়। তাছাড়া ছোটো মাছ বা কেঁচো হলেও হয়। আর বড়ো মাছের জন্য অনেক কয়েকটা বড়শির মধ্যে কেঁচো লাগিয়ে মাঝ নদীতে ফেলে দিই। বড়ো মাছ তো আর সবসময় পাই না, মাসে একবার দুইবার পাই বা কোনো মাসে পাই না। তবে যখন পাই তো মাসের খাটনি একদিনেই উঠে যায়। তবে কই, মাগুর, শিঙি বেশি মারি। সেটা দিয়ে আমার চলে যায়। একজনের তো, চলে যায়। তার থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে রাখি। স্টুডিও করার জন্য। পুঁটি মাছ মারি অল্প স্বল্প।

এখন যেখানে বসে আছি, এই জায়গায় স্টুডিও করব বলে ভেবে রেখেছিলাম আগে থেকে। কিছু টাকা বাঁচাতে বাঁচাতে বেশ কিছু টাকা হল, তখন একটা ক্যামেরা কিনলাম। বাড়ি বাড়ি, বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ফটো উঠাতে লাগলাম। তারপর পাড়ার বাগচীবাবু বললেন, 'নির্মল তুমি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বল, এই তোমার দোকানটা দেখিয়ে লোন নিয়ে দোকান সাজিয়ে গুছিয়ে ভালো করে চালু কর। ভালো ভালো ক্যামেরা নিয়ে এসে রাখ বিক্রির জন্য, রিলও নিয়ে এসে রাখ। রাস্তার উপর দোকান চলবে ভালো।' বাগচীবাবুর কথামতো লোনের জন্য খুবই দৌড়াদৌড়ি করতে হল, পেয়েও গেলাম। তার কথামতো দোকানটা চালু করলাম। একা চালাতে পারছিলাম না, তাই গোবিন্দকে রাখলাম।"

নির্মলের দোকানে বড়ো বড়ো দুইটা অয়েল পেইন্টিং ছবি টাঙানো আছে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছে ওর মা ও বাবার ছবি। ওর মা ও বাবাকে দেখিনি, তাই চিনতে পারিনি। তবে দুইজনের বৃদ্ধ বয়সের ছবি। নির্মলের মা'র বিধবার থান পরা ছবি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বাবা কি আগেই মারা গেছেন যে তোমার মা'র এরকম ছবি টাঙিয়েছো?"

"আমরা ছোটো থাকতেই বাবা মারা যান।"

"তোমরা তো ছোটো ছিলে, তখন তোমার বাবা কি বৃদ্ধ হয়ে গেছিলেন, তার মানে একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন?"

"বাবা আগে একবার বিয়ে করেছিলেন, সেই মা মারা যাবার পর আমার মাকে বিয়ে করেন। তখন বাবার বয়স হয়ে গেছিল। বাবা এই পক্ষের তিনজনকে রেখে গত হন। আমি, দাদা ও আমার ছোটো বোন, আমরা তখন একা হয়ে গেলাম। আমাদের দেখার কেউ নেই।

বড়ো পক্ষের দুই দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আমি কোনোরকমে নাইন পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়ে দিলাম। তখন থেকে কাজের চেষ্টা করতে লাগলাম। শুধু বোনের পড়াটা চালু রাখলাম। দাদা এক ঠিকাদারের কাছে কাজ পায়। এই কাজ করতে করতে দাদা ছোটো ছোটো ঠিকাদারির কাজ ধরতে থাকে। এই করে সংসার চলতে থাকে ও বোনের পড়াশোনা চলতে থাকে। বোনের পড়াশোনায় ঝোঁক বেশি বলে ও পড়াশোনা করতে থাকে। আমিও ভালো ঠিকাদারের কাছে কাজ পেয়েছিলাম, বাইরে বাইরে কাজ করতে যেতাম। কিন্তু কোথাও ছয় মাসের বেশি টিকতে পাইনি। সবাই বলত, 'তোমার কোনো কাজে মন নেই। শুধু খেলাধূলা করলে কি কাজ হয়?' তারা আমাকে ছাড়িয়ে দেয়। বাড়িতে বসে বসে আর কি করব, ঘুরে বেড়াতাম, আড্ডা মারতাম, বন্ধুদের সঙ্গে ডাব নারিকেল চুরি করতাম। এমনভাবে চুরি করতাম কেউ টের পেত না। এখনও মনে পড়ে, পাশের বাড়িতে একটা নারিকেল গাছে অনেক নারিকেল ফলেছে, নারিকেল গাছের গোড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত কাঁটাতার ও কাঁটা গাছ বেঁধে রেখেছে। সেটা দেখে আমি বন্ধুদের বললাম, এর নারিকেল ও ডাব চুরি করতে হবে। ওদের আবার বললাম, এখন একটা বুদ্ধি করতে হবে কাঁটা পার হয়ে গাছে উঠার। একজন বলল একটা মোটা বাঁশ নিয়ে এসে নারিকেল গাছে লাগাতে হবে, ওটা দিয়ে বেয়ে বেয়ে কাঁটাতার পার হয়ে যাব। তারপর নারিকেল পাড়ব। মই হলে খুবই ভালো হয়। মই পাব কোথায়! বাঁশ তো বাড়ির পিছন দিকে আছে। দেখিস বাঁশ নিয়ে আসতে শব্দ যেন না হয়। বন্ধুরা বলল, 'নির্মল তুই গাছে উঠ, এই মোটা লম্বা রশিটা নিয়ে উঠ।' আমি ভালো নারিকেল গাছে উঠতে পারতাম। রশি নিয়ে একটা মাথা নারিকেলের ডালে বেঁধে দিলাম। আর একটা রশির মাথা নীচে ফেলে দিলাম। সেটা নিয়ে ওরা ফেনসিং-এর বাইরে চলে গেল। বাইরে রাস্তার উপর। অন্ধকার রাত্রি, রাস্তায় লোকজন নেই, তখন তো আর এদিকে লাইট জ্বলত না, তাই আমাদের সুবিধা হল। একটা করে নারিকেল ও ডাবের কাঁদি কাটছি আর রশির মধ্যে দিচ্ছি। সেই ডাব আর নারিকেলের কাঁদি ভেসে ভেসে রাস্তায় চলে যেত। রাত্রেই পাড়া ডাব ও নারিকেল খেয়ে শেষ করে দিলাম। খোসাগুলো আর কোথায় ফেলব, যেখানে খেয়েছি ওখানেই রেখে দিলাম। সকালে উঠে হইহল্লা শুরু হয়ে গেল। আমরা তখন ঘুমাচ্ছি।

আমার ব্যবহার আর চালচলন দেখে মা আর জলপাইগুড়িতে রাখতে চাচ্ছেন না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আমি আরও খারাপ হয়ে না যাই, সেইজন্য মা দার্জিলিং গিয়ে মেজদাদার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর কি হল জানি না, আমাকে দার্জিলিং-এ গিয়ে মেজদাদার ওখানে থাকতে হল। দার্জিলিং-এ আমাদের একটা সোনার দোকান আছে। বাবা সেখানেই থাকতেন। এখন মেজদাদা থাকে। বাবা আগে থেকে জায়গা মেজদাদার নাকে

করে দিয়েছেন, মেজদাদা যেন জলপাইগুড়ি না আসতে পারে। দোকানও মেজদাদার নামে। সোনার দোকান। বাবা প্রথম জীবনে এখানেই কাটিয়েছেন আমার প্রথম মাকে নিয়ে। স্বর্ণকারের ব্যবসা, আমাদের আদি কারবার। আমাদের বংশগত পদবি কর্মকার, এখন রায় হয়ে গেছি। বড়ো পক্ষের আমার দুই বড়ো ভাই, তাদের ছেলেদের বয়স প্রায় আমার মতো। বড়ো দাদা চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। ওর ছেলেরা এখন ভালোই চাকরি করে। এই সব শোনা কথা। আমি বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছি বলে মা বলে ক'য়ে আমাকে দার্জিলিং-এ মেজদাদার ওখান পাঠিয়ে দেয়। মেজদাদা আমাকে পাওয়ায় মেজদাদার জন্য ভালোই হল, একজন দোকান পাহারার লোক পাওয়া গেল। দার্জিলিং-এ থাকতে কার না ভালো লাগে, কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে থাকা কি যে কষ্টের, তা আর কাউকে বোঝানো যায় না। দোকান। দোকান ছাড়া তো কিছু নেই। বাড়িতে যেতে হয় শুধু খাবার জন্য। শোওয়া পর্যন্ত দোকানে। এখানে যারা আছে, বেশিরভাগ ছেলে স্কুলে যাতায়াত করে। আমার মতো যারা এই বয়সে কাজ করে, তাদের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। তাদের ভাষাটা আলাদা। এখানে যারা থাকে, তারা প্রায় সবাই সেই ভাষায় কথা বলে থাকে।"

নির্মল বলেছিল, নির্মলের সবচেয়ে বেশি দুঃখ, কাজ করত, দোকানে বসত, কিন্তু হাতে একটাও পয়সা পেত না। তবুও নির্মলের ক্ষোভ ছিল না। দোল পুজোয় ভাঙের বড়া খাওয়া তার বেশি হয়ে গিয়েছিল। সেই নিয়ে বাড়িতে একটু বেশি অশান্তি হয়ে যায়। এ খাওয়ায় নির্মলের কোনো দোষ ছিল না। এত সুন্দর ভাঙের বড়া বানিয়েছিল, নির্মল নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। বলেছিল ভাঙের বড়া দুইটা খেলেই নেশা হয়ে যাবে। নির্মল কিন্তু পাশের দোকানের কর্মচারীর পাল্লায় পড়ে পাঁচটার বেশি খেয়ে ফেলেছিল। তারপর কী ঘটেছিল, নির্মল বলতে পারে না। আবার ফিরে জলপাইগুড়ি চলে আসে। তখন নির্মল অনেক ভালো হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে কতদিন বসেছিলে?"

"বেশিদিন বসতে হয়নি, একদিন দেখলাম, আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে, হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের পাশে, দোকান করার জন্য পরিষ্কার করছে। আমি সামনে দাঁড়িয়ে দোকানের কাজ দেখছিলাম, কীভাবে দোকান সাজায়। তখন নগেনদা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাকো'?"

আমি আমার বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম।

'বাঃ, আমার দোকানের একেবারে সামনে বাড়ি। কী নাম তোমার?'

'নির্মল।'

'পড়াশোনা কর না? তোমাকে সবসময় দেখি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে।'

'বাবা নেই তো, সেইজন্য পড়াশোনাও করি না।'

'তুমি আমার এখানে কাজ করবে? তোমাকে ফটো তোলা শিখিয়ে দেব।'

'মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।'

সেই ছোটোবেলা থেকে নগেনদার ওখানে কাজে ঢুকে গেলাম। আমাকে ছোটো ভাই-এর মতো দেখত। তাই ভাই-এর মতো সবরকম কাজ করতাম। কাজ করতে করতে ক্যামেরার কাজে আমার উৎসাহ বাড়তে লাগল।"

নির্মলের বাড়ির সামনে দোকান তো, নির্মলের খুবই সুবিধা। একবার করে বাড়ি এসে মার সঙ্গে দেখা করে যায়। কাজের যখন চাপ থাকে, দুপুরবেলা ওর নগেনদার ওখানে খেয়ে নেয়। তারপর নগেনদার কাছ থেকে ধীরে ধীরে কাজ শিখে নেয়। নির্মলের উপর ভরসা করে দোকান ছেড়ে দিয়ে নির্মলের নগেনদা বাইরে দোকানের মালপত্র কিনতে যায়। এখানে কাজ করতে করতে নির্মলরা দুই ভাই মিলে বোনের বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়েটা কলকাতায় হয়, বড়ো দাদার ওখানে। এই ব্যাপারে বড়ো দাদা অনেক সাহায্য করেছে।

নির্মল কাজ করতে করতে জবা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। যখন দোকানে কেউ থাকত না, নগেন খেতে বাসায় যেত, তখন জবা আসত। জবাদের বাড়ি নির্মল গেছিল ওর ছোটো কাকার বিয়েতে ফটো উঠাতে। জবার ছোটো কাকা যখন বিয়ে করতে যায়, তখন নির্মলকে নিয়ে গেছিল বরযাত্রীর সঙ্গে। বলেছিল ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যেতে। সেই সময় জবা প্রায় বেশিরভাগ সময়ে নির্মলের সঙ্গে থাকত, ছবি তোলার লোভে। তারপর থেকে নির্মল প্রায় জবাদের বাড়ি যেত। নির্মল বলেছিল, "জবার বাবা, মা ভেবেছে এই স্টুডিওটা আমার। নগেনদা এসে খবরাখবর নেয়, আমি ঠিকমতো কাজ করছি কিনা। তার উপর ওদের ভাই নেই, ওরা তিন বোন। জবা হচ্ছে মেজ বোন। কথা খুবই বলে, সব সময় কথা বলতেই থাকে। আমি জবার কথা, ওদের বাড়ির কথা সব মাকে বলি। বলি জবারা আগে এখানে ছিল না, বেশ কয়েকমাস হল এখানে এসেছে। বাড়িও করেছে, কামারপাড়ায়। বাহাদুরগঞ্জে জমি আছে, ধানি জমি। বাবা একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে। এখানে এসে বাড়ি করেছে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য।" নির্মল কথাগুলো ওর মাকে বলত। প্রথম প্রথম শুনতেন, কিছু বলতেন না। পরে বলেছিলেন, "যখন তুই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাবি, তখন হবে মুস্কিল। তুই যে কাজ করিস, যে বেতন পাস, মেয়েটাকে বিয়ে করলে খাওয়াবি কী? যা বেতন পাস তোর নিজের চলে না। তা ছাড়া তোর সঙ্গে ওরা ওদের মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?"

"ওরা জানে দোকানটা আমার।"

"এখন জানে তোর। একদিন তো জানতে পারবে দোকানটা তোর না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কি পার পাওয়া যায়!"

মার কথাগুলো নির্মলের মনে লেগেছে। তবু কিন্তু জবার পিছু ছাড়াতে পারে না। তারপর মা একদিন অসুখে পড়ল। অসুখের মধ্যে বলতে থাকে, "আমার শরীর আগুনের মতো জ্বলছে।" একদিন বললেন, "আমার গা-টা খুবই জ্বলছে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" আমি তো স্টুডিওতে আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দাদা বাড়িতে থাকছে বেশিরভাগ সময়। মার কথাগুলো সহ্য করতে না পেরে মাকে কুয়োর পারে পিঁড়িতে বসিয়ে গায়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল। দু'এক বালতি জল ঢালাতে মা আরাম পাচ্ছিলেন। আরাম পাওয়ার কথা শুনে দাদা কুয়ো থেকে জল উঠিয়ে বালতি বালতি ঢালতে লাগল। দাদা এত জল ঢেলেছিল যে মা'র নিমুনিয়া ধরে গেছিল। ডাক্তারকে দেখানোর পর ডাক্তার বলছে, "নিমুনিয়া লেগেছে, হসপিটালে নিয়ে যাও।" সেই যে নির্মলের মা'র অসুখ করল, আর বাঁচাতে পারল না। হসপিটালে হসপিটালে অনেক দৌড়াদৌড়ি করল, আর বাঁচাতে পারল না। নির্মলের মা'র এই অবস্থায় মারা যাওয়ায় ওর দাদার মনে খুবই লেগেছে। ওর দাদা ভেবেছে ওর জন্য ওর মা মারা গেছে। আগের মতো আর উৎসাহ নিয়ে কাজ করত না। ঝিম মেরে পড়ে থাকত। কাজ না করলে খাবে কী, তাই মাঝে মাঝে একটু আধটু কাজ করত।

জবা নির্মলকে একদিন বলল, "তোমার মা মারা গেছেন, এখন আমাদের বিয়ে নিয়ে আমার মা বাবার সঙ্গে কে আলোচনা করবে?"

"তুমি তো জানো না, এখন কাজ করে যা বেতন পাই, সেটাতে আমার নিজের চলে না। তোমাকে বিয়ে করে কী খাওয়াব?"

"মা, বাবা আর বাড়ির সবাই জানে এটা তোমার দোকান, আমিও কিছু বলিনি। তুমি তোমার নগেনদাকে বলো আরও কিছু বেতন বাড়াতে। আমি ওর মধ্যে চালিয়ে নিতে পারব।"

জবার বাবা ও মা দোকানের ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর নেয়নি। যখন দেখল নিজের মেয়ে নির্মল ছাড়া কিছু বোঝে না, তখন নির্মলকে ডেকে বললেন, "তোমার স্টুডিও দোকানটা তোমার নামে না তোমার দাদার নামে?" নির্মল তো কথা বুঝতে পারেনি, জবার মা কি বলছেন। জবা এসে বলেছিল, "তোমাকে মা দুপুরবেলা আমাদের বাড়ি যেতে বলেছে।" নির্মলের দাদা তো দোকান সম্বন্ধে কিছুই জানে না। নির্মল বলল, "বাড়িতে আমি ও দাদা। আসল বাড়ির অংশীদার বলতে আমি ও দাদা। এখন আর কেউ নেই। বোন আছে, সে এখন কলকাতায়। আর দাদারা, আত্মীয়স্বজন, ভাসতা, ভাতিজি আছে, তারা আমাদের কোনো খবর নেয় না।"

"তোমাদের রান্না কে করে?"

"বেশিরভাগ সময় দাদা করে, মাঝে মাঝে আমি সময় পেলে করি।"

"তোমরা এখানে অনেকদিন থেকে আছ?"

"আমার ঠাকুরদাদা খুবই অল্পবয়সে এখানে আসেন। দাদু ভালো সোনার কাজ জানতেন। তারপর দেশে বাড়ি ঘর জমি জায়গা বিক্রি করে এখানে এসে বাড়িঘর তৈরি করেন। তারপর থেকে আমরা এখানে।"

"তুমি পড়াশোনা কতদূর পর্যন্ত করেছ?"

"বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারিনি। মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, দাদাও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার নিজের জন্য পড়াশোনা হয়নি।"

"তুমি যে দোকানে বস, দোকানে তো ভালো কাজ হয়, সবকিছু তোমাকে দেখতে হয়?"

"আমিই সবকিছু দেখাশোনা করি।"

"টাকা পয়সার হিসাব তোমার কাছে থাকে না তোমার দাদার কাছে?"

"দোকানের সারাদিনের কাজের হিসাব রাতে নগেনদাকে দিতে হয়।"

"নগেনদা মানে!"

"দোকানটা তো নগেনদার, দোকানের মালিক নগেনদা, আমি ওখানে কাজ করি।"

"তার মানে নগেনদা তোমার আপন কেউ না...। ওখানে কাজ করে মাসে মাহিনা পাও ...। বেশি মাহিনা তো পাও না। তোমার দাদা ও নগেনদা আলাদা লোক।"

জবার মা বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিলেন। তারপর বললেন, "দেখো নির্মল, তুমি ভালো ছেলে, তোমার বোঝার বয়স হয়েছে। তুমি নিজে থেকে চিন্তা করে দেখো। আমি তোমাকে পরিষ্কার খোলামেলা বলছি। তুমি যদি জবাকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে একটা দোকানে কাজ করে যা টাকা পাও, তাতে নিজে খাবে, না জবাকে খাওয়াবে। তোমার যদি দোকানটা হত...। তোমার নগেনদা বেশি টাকাও বেতন দিবেন না যে দুইজনের সংসার নিশ্চিন্ত মনে চলতে পারে। তারপর তুমি বেশিদূর লেখাপড়া শিখোনি যে অন্য জায়গায় ভালো চাকরি পাবে। তার চেয়ে জবাকে ভুলে যাও। আমরা ওর অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে পারি। এই করে তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মেয়েটার আমার পড়াশোনা হল না। এখন আমরা তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।...

নির্মল, তুমি তো আমার ছেলের মতো। তোমার কথা আমরা অনেক ভেবে দেখেছি। এখন যদি তোমার সঙ্গে জবার বিয়ে দিই, তবে দুইটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। এদিকে আমার ছেলে দেখার চেষ্টা করব। ভালো ছেলে পাওয়া তো সোজা কথা না। যতদিন না ছেলে পাওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত নিজেকে তৈরি করো, ভালো উপার্জন করার রাস্তা বার করো

যেটা দিয়ে তোমরা দুইজন সংসার করে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকতে পারো। না হলে ভালো ছেলে পেলে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।"

নির্মলের কর্মচারী সন্ধ্যা আটটার মধ্যে স্টুডিও বন্ধ করে দিত। আটটার আগে থেকে ছটফট করত দোকান বন্ধ করার জন্য। বন্ধ করার সময় দোকানের একটা পাল্লা খোলা রেখে দিত, তখন আমরা বসে গল্প করতাম। নির্মল ও আমি যখন বসে থাকতাম, নির্মলের বড়ো ও বাচ্চা নিয়ে চার-পাঁচটা বিড়াল ছুটোছুটি করত। নির্মলের কর্মচারী গোবিন্দ থাকতে বিড়ালগুলো আসত না। গোবিন্দ বিড়াল সহ্য করতে পারত না। সেইজন্য বিড়ালগুলো গোবিন্দকে ভয় পেত। বিড়ালের পিছনে নির্মল টাকা খরচ করে মাছ নিয়ে আসে, সেটা গোবিন্দর পছন্দ না। তাই নির্মল গোবিন্দকে দিয়ে মাছ হোটেল থেকে নিয়ে আসাত না, গৌর ও নিতাই-কে দিয়ে নিয়ে আসাত, তবু সন্ধ্যা আটটার পর। নির্মল দুপুরবেলা নিজের পাত থেকে মাছ ভাত মেখে দিত। প্রতিটি বিড়াল দেখতে খুবই সুন্দর। সাদা হলুদ। কি সুন্দর ঘরময় ছোটাছুটি করত। নির্মলের ধারণা জবার আত্মা বিড়াল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিড়ালগুলো আমার সঙ্গেও খেলা করত।

"জবা শেষবার যখন এসেছিল, আমি মাছ ধরার জন্য ছিপগুলো বার করছি এবং মাছের চারা তৈরি করছি। তখন আমার চাকরি নেই। জবার বাড়ি থেকে বার হয়ে বেতন বাড়ানোর জন্য নগেনদাকে বলেছিলাম। তারপর আর নগেনদার ওখানে যাইনি। দাদাও বলেছিল, আর খাওয়াতে পারবে না, তখন আর কী করার ছিল! জবা এসে উপস্থিত, অনেকদিন পর জবাকে দেখলাম। দেখলাম চোখমুখ লাল হয়ে আছে। মনে হয় সারারাত ধরে কেঁদেছে, না হলেও অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। ওকে ধরব কী করে, ওর চোখের জল কী করে মোছাবো, আমার হাত দুটো তো মাছের চার বানাতে গিয়ে নোংরা হয়ে গেছে। জবা বলল, 'আমার বিয়ে কাল বাদ পরশুদিন। আমাকে কোথাও বার হতে দেয় না, আমি পালিয়ে এসেছি। তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ের কথা ভাবতে পারি না। এখন তো তুমি কাজটা ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে আছ। চলো, আমরা দুইজনে কোথাও চলে যাই। তোমাকে ছাড়া আমি আর বাঁচব না'।"

'কোথায় যাব বলো, আমার আত্মীয়স্বজন যারা আছে, তারা আমাকে কেউ পছন্দ করে না, এমনকি আমার নিজের ছোটো বোন, যার কলকাতায় বিয়ে হয়েছে। নগেনদার ওখান কাজ ছাড়ার পর গেছিলাম, একদিনও থাকতে পারলাম না। আমাকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। সৎ দাদারা যা আছে তা তো আর বলার নয়। এখন তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব! এখন নিজে যে খাব তার কোনো ঠিক নেই।'

'তোমার সঙ্গে শুধু দেখা করতে এলাম, আর কোনোদিন হয়তো দেখা করতে পারব না, দেখা হবে না।' বলে আমার হাত ধরে দেখল। আমার তালু দুইটার নোংরা নিজের হাতে, তালুতে মাথায় মেখে নিল। আমি বললাম, 'এগুলো মাছের চারার জন্য তৈরি, বাজে গন্ধ। তোমার গা-টা গন্ধ হয়ে যাবে'।"

'শেষদিন, তোমার এই নোংরা গল্পটা চিরদিনের জন্য থাক। আমি চলে যাবার পর থেকে তুমি ভালো থাকতে চেষ্টা করবে এবং ভালো থাকবে, কোনো দুঃখ করবে না।' তারপর জবার বোন এসে জবাকে নিয়ে চলে যায়। জবা চলে যাবার পর আবার ছিপ ঠিক করে মাছ মারতে চলে যাই। মাছ মারতে ভালো লাগছিল না, তবু ছিপ নিয়ে বসেছিলাম। বাড়িতে আসতে পারছি না, কেমন যেন খারাপ খারাপ লাগছে। বাড়ি এলাম, খেলাম কিন্তু রাতে কিছুতে ঘুম আসছে না। বার বার জবার মুখটা ভেসে উঠতে লাগল। ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জবার ছোটো বোন ও দাদার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দাদা এত জোর দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল, আমি ভাবলাম কী হয়েছে আবার! বেলাও বেশ হয়ে গেছে। দরজা খুলে দেখলাম জবার বোনের চোখে জল। আমাকে দেখে জোরে জোরে কাঁদতে লাগল, 'মেজদি আর নেই, তোমাকে ডাকছে।' এই কথাগুলো কোনোরকম বলে আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

আমি রাস্তায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

'মেজদি আত্মহত্যা করেছে।'

'কী করে আত্মহত্যা করল?'

'আমি কিছু জানি না, তুমি গেলেই বুঝতে পারবে।'

আমি পৌঁছে গিয়ে দেখি এর মধ্যে পুলিশ পৌঁছে গেছে। পুলিশই প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলল, 'তোমার নাম নির্মল? তোমার সঙ্গে কাল জবার দেখা হয়েছিল? কী কথা হল তোমার সঙ্গে?'

'বলছিল ওর কালকে বিয়ের কথা। আরও বলছিল, এই আমাদের শেষ দেখা। তারপর হাতের নোংরাগুলো নিজের হাতে, মাথায় লাগিয়ে নিল।'

'তুমি তো কিছু কাজ করো না।'

আমি মাথা নাড়িয়ে বলেছিলাম, 'না।' তারপর থেকে জবার সব কাজ আমাকে করতে হল। ওর মা ও বোন আমাকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। ওর হাতে, মাথায় তখনও আমার নোংরাগুলো লেগে আছে তবে শুকিয়ে গেছে। পুলিশ গাড়ি করে নিয়ে যায় জবাকে, সঙ্গে আমাকেও যেতে হল, সঙ্গে জবার বাবাও ছিলেন। থানা থেকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে

পোস্টমর্টেম করে সোজা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সব কিছু করতে করতে রাত হয়ে যায়। তখন আমার এমন অবস্থা, আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ ছিল না।

দাদা আর কী করবে, মা মারা যাবার পর দাদা নিজে আর নিজের মধ্যে নেই। জবা কিন্তু বারবার একটা কথা বলত, 'আমি যদি এখন তোমাকে না পাই, মরে যাবার পর তোমার বাড়ি ঘরে এসে বাসা বাঁধব।' জবা আমার বাড়িতে থাকে। আমার কাছে যে থাকে আমি মাঝে মাঝে টের পাই। দাদা বেঁচে থাকতে ঠিকমতো বোঝা যেত না। দাদা মারা যাবার পর বোঝা যায়। দাদা যে কেমন হয়ে গেছিল, ভাত বা অন্যান্য খাবার খুব একটা বেশি খেত না। মদ, খালি কাচ্চি মদ খেত। কাচ্চি মদ খেতে খেতে কিডনি দুইটা ড্যামেজ হয়ে গেছিল। যদিও টের পেলাম, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছিল। তখন আমার হাতেও টাকা ছিল। দোকানে কাজ ভালো হচ্ছে। অনেক ডাক্তার দেখান হল, কিন্তু কিডনি নতুন লাগানোর অতো টাকা আমার কাছে নেই। তাই দাদাও একদিন মারা গেল। এত বড়ো বাড়ি, এখন আমি একা। দাদার ঘরটা তালা লাগিয়ে রাখি আর আমার ঘরটা সবসময় খোলা রাখি। দোকানের পিছনেই আমার ঘর। তাই কোথাও যাই না। সবসময় দোকান আর ঘর করি। জবা বলেছিল মরার পর ও আমার এখানে থাকবে। সেইজন্য সব জায়গায় ওর ছায়া অনুভব করি। এখন আর আমার এখানে আত্মীয়স্বজন কেউ আসে না। আমি নিজেই মনে করি আমার কেউ নেই। তবে কিছুদিন আগে দার্জিলিং-এর মেজ বউদি এসেছিল, জামা ও প্যান্টের কাপড় নিয়ে। সঙ্গে মিষ্টিও নিয়ে এসেছিল। সবাই জেনে গেছে আমি এইভাবে জীবন কাটিয়ে দিব, সেইজন্য এসে প্রথম কথা বলল, 'তোমার এই জায়গা জমিগুলোর কী করবে?' কথাটা শোনার পর আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল। আমি সোজা বলে দিয়েছি, 'এখানে তোমাদের কোনো অংশ নেই। বাবা তোমাদের জন্য এখানে কোনো জায়গা রাখেনি। তোমাদের সব জায়গা দার্জিলিং-এ।' তারপর মিষ্টি, জামার কাপড় ও প্যান্টের কাপড় সব ফিরৎ দিয়ে দিলাম।"

নির্মলের রাস্তার ধারে দোকান হলেও দোকানের পিছনে বেশকিছু জায়গা নিয়ে নির্মলের বাড়ি। ঘর তিনটা ছাড়া বেশকিছু খালি জায়গাও আছে। তার মধ্যে আম গাছ, পেয়ারা গাছ ও লেবু গাছ আছে। ফল হলে নির্মল সব ফল সবাইকে দান করে। আমি অনেকবার লেবু, কাঁঠাল বাড়ি নিয়ে গেছি। সব ফলগুলোর বেশিরভাগ নির্মলের কর্মচারী গোবিন্দ নিয়ে যায়। তিনটা ঘরই আগেকার আমলের ঘর। উপরে টিনের চাল, নীচটা অর্ধেক পাকা করা। বাকি উপরটা বাঁশের বাতা দেওয়া, তার উপর বালি ও সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার করে চুন দিয়ে সাদা রং করে দেওয়া হয়েছে। নির্মলের ঘরে ঢুকেছিলাম, তখন দেখেছি উপরে ছাদটা বাঁশের বেড়া দিয়ে কভার করা। ঘরের ভিতরে দেখেছি, দুইটা চৌকি একসঙ্গে

লাগিয়ে পাতা। তার একটার মধ্যে বিছানা পাতা। সেই বিছানায় শোবার জন্য দুই দিকে দু'টা বালিশ। একটা জবার জন্য, একটা নিজের জন্য। বিছানার মধ্যে মশারি সবসময় টাঙানো থাকে। কোনো সময় মশারি খুলে এমনি রাখে না। সেই কারণে দুইটা মশারি রেখেছে। একটা নোংরা হলে সেটা খুলে আর একটা সঙ্গে সঙ্গে টাঙিয়ে দেয়। মশারির পাশে খালি চৌকির উপর বাবার আমলের ট্রাঙ্ক রাখা আছে, টাকাপয়সা জামাকাপড় থাকে। এখন নির্মলের টাকা আমদানি ভালোই। নিজে একা কত খাবে! সব টাকা বিছানায় বিছিয়ে রাখে, ট্রাঙ্কে রাখে, তবে ট্রাঙ্কের তালা লাগায় না। দোকানের ব্যবসার জন্য কিছু টাকা দোকানের আলমারিতে ও ডার্করুমের আলমারিতে রাখে। আমি যখন দোকানে বসি, আশেপাশে কেউ থাকে না। দোকানের একটা পাল্লা খোলা থাকে। তখন নির্মল তার নিজের কথা বলতে থাকে। কথা বলায় তার ক্লান্তি আসে না। অন্যসময় লোকজন বেশি থাকলে কথা কম বলে। নির্মল ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা রাখে না। বিছানায় টাকা সাজিয়ে রেখে তার উপর তোষক চাদর বিছিয়ে রাখে। নির্মলের মনের ভাব এই, টাকার জন্য জবার সঙ্গে নির্মলের বিয়ে হয়নি। এখন এই টাকাগুলো জবার। জবার কাছে গচ্ছিত থাক। 'আমি তো একদিন না একদিন . . ., তার আগে পর্যন্ত চেষ্টা করব, জবার সঙ্গে এরকমভাবে থাকার।'

তারপর একদিন নিতাই এসে বলল, 'আপনার বাড়ির সামনে, নালার উপর, আপনার দোকানের পাশে, ফটো বাইন্ডিং-এর দোকান দিতে চাই, যদি আপনি অনুমতি দেন।' কত আর হবে নিতাই-এর বয়স। খুব বেশি হলে ১৯/২০, জবার বয়সী। ওর মুখে যেন জবার ছায়াটা দেখতে পেলাম। তখন কি আমি আর না করতে পারি। ওকে অনুমতি দিলাম। নালার পাশে টিন দিয়ে বাউন্ডারির বেড়া দিয়েছিলাম। নিতাই নালার উপর বসতে চায়। নালার উপর কাঠ বিছিয়ে, রৌদ্র আটকানোর জন্য উপরে পলিথিনের কাপড় লাগিয়ে, কাঠের বাতা নিয়ে এসে কাঁচের মধ্যে ছবি বাঁধিয়ে বিক্রি করতে লাগল। নিতাই-এর দোকানটা এই জায়গায় ঠিকমতো চলছিল। আর আমার টুকটাক কাজ করে দিত। এমনিতে ওর প্রতি আমার কেমন যেন দুর্বলতা পড়ে গেছে। ওকে দেখলে আমার জবার কথা মনে পড়ে।"

"নির্মল, জবা তো মারা গেছে, আত্মহত্যা করেছে। কীভাবে মারা গেছে?"

"সেটা অনেক কষ্টের, বলতে খারাপ লাগে। বাথরুমে গিয়ে গলায় ফাঁসি লাগিয়েছিল। রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, সেই সময় বাথরুমে যায়। সকালে ওর বাবাই প্রথম জবাকে ঝুলতে দেখেন। আমি যখন দেখি, মুখটা এমন হয়েছে তাকালেই গা শিরশির করে ওঠে। তারপর হসপিটালে নিয়ে কাটাছেঁড়া করা, এইগুলো জবার বাবার সামনে হচ্ছিল, আমিও সঙ্গে ছিলাম, আর সহ্য করা যাচ্ছিল না। জবা মারা যাবার এক মাসের মধ্যে, জবার বাবা জমি জায়গা বাড়ি ঘর বিক্রি করে দেন। বিক্রি করে সবাইকে নিয়ে কোথায় যে চলে যান, কেউ

জানতে পারেনি। তবু আমি একটু আধটু খবর নেবার চেষ্টা করেছিলাম। কোনোকিছু কেউ বলতে পারেনি। তারপর আমি আর বেশি খোঁজাখুঁজি করিনি, কারণ আমার নিজের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো। দাদার দুইটা দোকানের ভাড়া দিয়ে চলত, দোকান দুইটা বড়ো না যে বেশি ভাড়া পাবে। আমার এই দোকান প্রথম যখন করি, ছোটো ছিল। পাশের জায়গাটা একটা স্টেশনারি দোকান ছিল। ছেলেটা ভালো একটা চাকুরি পাওয়াতে দোকান ছেড়ে দেয়। ছেলেটার বাবা আর দোকানে বসতে চাইলেন না। বয়স হয়ে গেছে বলে যা জিনিসপত্র ছিল নামমাত্র দামে বিক্রি করে দোকানটা আমাকে হ্যান্ডওভার করে দিলেন। তাই আমিও দোকানটা বাড়িয়ে দিলাম, দেখতেও সুন্দর হল।"

"গৌর আগে দোকান দিয়েছে না নিতাই?"

"নিতাই। নিতাই গৌরকে এখানে নিয়ে আসে। গৌর যেখানে এখন বসেছে, বাগচী বাড়ির সামনে রাস্তার উপর জায়গাটায় . . . নিতাই আসে ওর দাদা গৌরকে নিয়ে আমার কাছে। আমাকে বলে, দাদা গামছা বিক্রি করতে চায়, আপনি যদি বাগচীবাবুকে বলে ওই জায়গাটায় দাদার বসার ব্যবস্থা করেন, তাহলে দাদা ওই জায়গায় বসে গামছা বিক্রি করতে পারে, বাগচী বাড়িটা বেশ বড়ো, তারা অনেক কয়েক ভাই। তাদের ছেলে মেয়ে বেশ কিছু। বাইরে যদি কেউ বসে, তাহলে বাইরে দিকটা পাহারা হয়ে যায়। এবং যে বসবে তাকে দিয়ে টুকটাক কাজও করানো যাবে। সুতরাং ওরা আপত্তি না করে বরং খুশিই হল, না হলে অনেকে যখন তখন গেট খুলে ভিতরে ঢুকে যায়। গৌর প্রথমে এসে বস্তা পেতে গামছা বিক্রি করত। গামছা আর ক-জন কিনবে, আমি গৌরকে বললাম, গামছা বিক্রির চেয়ে তুই বরং প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি কর। সেই থেকে গৌর গামছা বিক্রি বাদ দিয়ে কাপ, প্লেট, চামচ, অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্র, বাসনপত্র, কাপড় ঝুলানোর হ্যাঙ্গার বিক্রি করতে লাগল। বিক্রিও হতে লাগল ভালো। রাস্তার যাতায়াতের পথে পেতে লাগল, লোকে কিনতে লাগল। গৌর ও নিতাই দুইজনেরই রাস্তার উপর দোকান ভালো চলতে লাগল।" নিতাই-এর দোকানও ভালোই চলে। বেশিরভাগ ফটো ঠাকুর দেবতার, ছোটো বড়ো অনেক ফটো বাঁধিয়ে রাখে। ঘরে পুজোর জন্য অনেকে এসে কিনে নিয়ে যায়। তাছাড়া কোনো মহাপুরুষের জন্মদিনে ফটো সবাই কিনে নিয়ে যায়। অনেকে আবার ফটো বাঁধিয়ে নিয়ে যায়।

নির্মল বিড়ালের খাবার জন্য একটা ছোটো ব্যাগ বানিয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা-আটটার সময় একটা ডাক দিত নিতাই বলে। নিতাই দৌড় দিয়ে আসত। না ডাকলেও অনেক সময় নিতাই চলে আসত। ব্যগটা ও টাকা হাতে দিতেই নিতাই চলে যেত। নিতাইকে কিছু বলতে হত না। নিতাই ও হোটেলের লোকজনের সবাই জেনে গেছে এটা

নির্মলের ব্যাগ। চা বা জলখাবার দরকার হলে নিতাই বা গৌর দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসে দিত। সবসময় এদের কাছে পেত বলে এরা নির্মলের নিজের লোক হয়ে গেছে। নির্মল ভিতরের একটা ঘর ওদের দিয়েছে বিক্রির মালপত্র রাখার জন্য। রাতে যখন নিতাই ও গৌর বাড়ি যায়, তখন তাদের যত বিক্রির মালপত্র এই ঘরটার মধ্যে রেখে যায়।

ওরা যখন এদেশে চলে আসে, ওদের কিছুই ছিল না। এমনকি থাকার জায়গা পর্যন্ত না। এগুলো সব নির্মলের কাছ থেকে শোনা। নিতাই গৌর তখন ছোটো। ছোটো বলেই ওরা প্রথমে চা-এর দোকানে, পরে হোটেলগুলোতে বয়-এর কাজ করত। আর ওদের বাবা চানার ঘুগনি বা মটরের ঘুগনি বিক্রি করত। বালতি করে রাস্তায় রাস্তায় চলতে চলতে ঘুগনি বিক্রি করত। এইভাবে এসে কোনোরকমে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। যখন নিতাই একটু বড়ো হল, নিতাই ফটো বাইন্ডিং-এর দোকানে কাজের জন্য ঢুকে পড়ল। আর গৌর বাসনের দোকানে। গৌর ও নিতাই-এর রাস্তায় হকারের দোকান খুবই ভালো চলতে লাগল। আশেপাশের দোকানের লোকের সঙ্গেও পরিচয় হতে লাগল। "এরপর একদিন গৌর আমার একটা দোকানের ভাড়া নিয়ে বসল। যে দোকানটা আগে ঔষধের দোকান বলেছিলাম, এখন ওটা গৌরের বাসনের দোকান। নামও একটা দিয়েছে দোকানটার গৌর। রাস্তার উপর দোকান, লোকের যাতায়াতের পথেই পড়ে, সেইজন্য বিক্রিও ভালো হয়।"

গৌরের দোকান হওয়াতে নিতাই এখন নির্মলকে বলতে লাগল, "দাদাকে দোকান দিয়েছেন, দাদা পরে এসেও আগে দোকান পেল। আমাকে বললেই দোকানটা আমি নিয়ে নিতাম। এবার আমার একটা ব্যবস্থা করুন।"এই একই কথা প্রায়দিন এসে নিতাই নির্মলকে বলত। নির্মল আর সহ্য করতে না পেরে বলল, "তুই যেখানটায় বসিস তার টিনের বেড়ার পিছনে ইঁট দিয়ে গাঁথনি করে একটা ছোটো দোকান কর। টিনের বেড়াটা খুলবি না। এমনভাবে ঘরটা বানাবি, বাইরে থেকে যেন বোঝা না যায় টিনের বেড়া। যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে। বেড়ার লাগালাগি ঘর উঠাবি। না হলে মিউনিসিপ্যালিটির ঝামেলায় পড়তে হবে। আত্মীয়স্বজন, লোকজন নানা কথা বলবে।"

নিতাই নিজের টাকায় দোকানটা তৈরি করল। এমনভাবে তৈরি করল, আমি যে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা দেকানে যাই, আমি নিজেই টের পাইনি। যখন দোকানটা প্রায় হয়ে গেছিল তখন আমি টের পেলাম। দুই ভাই কিন্তু শাটার লাগিয়ে, সাজিয়ে সুন্দর করে নিয়েছে দোকান দুইটাকে। বিক্রি ভালো হতে লাগল। পার্মানেন্ট দোকান বলে নির্মলও নিতাই ও গৌরের কাছ থেকে কোর্টের স্ট্যাম্প পেপারে সই করে নিয়েছে। নিতাই ও গৌরের দোকানের পজিসনের জন্য যে টাকা নির্মল নিয়েছে, দোকান ছেড়ে দিলে নির্মল

টাকা ফিরৎ দিয়ে দেবে। নিতাই-এর দোকান তৈরি করতে যে টাকা লেগেছে, সেটা দোকানের পজিসনের জন্য ধরে নিয়েছে।

নির্মল আর একটা জিনিস করেছে। নিতাই ও গৌর দোকান করেছে, সেইজন্য ওদের কাছ থেকে নির্মল ভাড়া নেয়। ভাড়া নেওয়ার একটা ছাপানো রসিদ বই বানিয়ে নিয়েছে। প্রতি মাসে ভাড়ার কিছু টাকা নির্মলের কাছে আসে। ভিতরে যে ঘরটায় গৌর মালপত্র রাখে, সেটার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে নির্মল গৌরের কাছে ভাড়া নেয়। মাসের পর দেখা যায় খরচের পর নির্মলের ভালোই টাকা বেঁচে যায়। সেই টাকা কিন্তু নির্মল ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। বালিশের তলায়, বিছানার তলায়। খাবার মধ্যে দুপুরের ভাত গোবিন্দর বাড়ি থেকে আসে, সেটার জন্য মাসকাবারের হিসাবে গোবিন্দকে টাকা দেয়। বাদবাকি দোকান থেকে কিনে খায়। এমনকি রাত্রের খাবারটা পর্যন্ত ভালো খাবার হিটারে নিজে বানিয়ে খায়। খাবারের মধ্যে প্রোটিনটা একটু বেশি হয়ে যায়। যেমন একদিনের মধ্যে সকালে হয়তো ডিম খেল, একটা ডিমে নির্মলের হয় না। দুপুরে মাছ প্রতিদিন খায়। বিকালে নিতাই ছানা কিনে নিয়ে এসে দেয়। রাতে হয়তো কোনোদিন মাংস, না হলে ভালো করে খিচুড়ি বানিয়ে খায়। এই হাই প্রোটিন খাওয়ার জন্য নির্মলের মাঝে মাঝে পায়খানা হয়। ল্যুসমোশন যাকে বলে নিতাই, গৌর ও গোবিন্দ ওষুধ এনে দেয়। নির্মল যখন পায়খানা যায়। দোকানে বসার সময় পায় না। তখন সবাই জেনে যায় নির্মলের পায়খানা হচ্ছে। তারপর সিঙ্গাড়া, কচুরি, জিলাপি, রসগোল্লা এগুলোও খেতে খুবই ভালোবাসত।

নির্মল যেদিন মারা যায়, রোববার রাত বারোটা বা তারপর মারা যায়। রোববার ছুটি, দোকান বন্ধ, গোবিন্দরও ছুটি, তার উপর গোবিন্দ বাসায় নেই, শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। নিতাই ও গৌর দোকান খুলে রেখেছে। আমি যেরকম প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নির্মলের ওখানে যাই, রোববার দিনও নির্মল আমার জন্য দোকানের দুটো পাল্লা খোলা রাখে। আমি কাউন্টারের সামনে বসি, নির্মল ভিতরে। সেদিন গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ। গৌরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "নির্মলের দোকান পুরো বন্ধ দেখছি। কোথাও যায়নি তো আবার!"

"যান না, ভিতরে গিয়ে দেখুন, শুয়ে আছে। পায়খানা হচ্ছে।"

গিয়ে দেখলাম নির্মল শুয়ে আছে। আমি ডাকতে মশারিটা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বলল, "দুপুরের পর থেকে পায়খানা হচ্ছে। প্রথম দিকে পায়খানা ভালোই ছিল, কিন্তু বিকালের পর থেকে পায়খানা খুবই পাতলা হচ্ছে।"

"ডাক্তার দেখাও নি! ডাক্তার দেখাও।"

"না, ডাক্তার দেখাব না, শঙ্করের ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যাব। শঙ্কর ওষুধ দিয়েছে, খাচ্ছি। হেঁচকি খুব হচ্ছিল। হেচকিটা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"গোবিন্দ জানে, গোবিন্দকে খবর দিয়েছ?"

"দুপুরে নিতাই আমার জন্য ভাত নিয়ে আসতে যখন যায়, দেখে গোবিন্দ ওর শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভাতের টিফিনক্যারি ওর দাদার কাছে রেখে গেছিল।"

আমি রাত দশটায় ফেরার সময় নির্মলকে একবার দেখতে গেছিলাম। তখন দেখি নির্মলের পায়খানা আরও বেশি হচ্ছে। নীচে কিছু পড়া নেই। বিছানায় পায়খানা করছিল, ডান হাত দিয়ে পায়খানার জায়গাটা পরিষ্কার করছিল। আমার গা-টা শিরশির করতে লাগল এই নোংরাগুলো দেখে। "তোমাকে গৌর নিতাইকে দিয়ে হসপিটালে নিয়ে যাই।" এই বলে আমি জোর করে নিয়ে যেতে চাইলাম। গিয়ে শঙ্করকে বললাম কথাটা। শঙ্করও একবার বলল হসপিটালে যাবার কথাটা। শঙ্করের কথাও নির্মল শুনতে চায় না। ও ঘর থেকে বাইরে কোথাও থাকতে চায় না। বিছানা ছাড়া নড়তে চায় না। ঘরময় পায়খানা, বিছানায় পায়খানা।

তারপর রাত যখন দশটা হল, বাড়ি চলে এলাম। মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন নির্মলকে দেখতে যাই, তখন ঘর বা দোকানের চাবি গোছা গোবিন্দর হাতে। নির্মলের কাছে আমাকে নিয়ে গেল, এমনি দরজা লাগানো ছিল, ঠেলে দিতেই খুলে গেল। দেখলাম ধপধপে সাদা চাদরে নির্মল শুয়ে আছে। পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ানো। ঘর আর আগের মতো নোংরা না, পরিষ্কার। কোথাও পায়খানার চিহ্ন নেই। আমি গোবিন্দকে বললাম, "এগুলো পরিষ্কার কে করল?"

গোবিন্দ বলল, "আমাকেই পরিষ্কার করতে হল। এত সকালে লোকজন কোথায় পাব। আমি সকালবেলা এসে দেখি মেঝেতে পড়ে আছে। শরীরে প্রাণ নেই। পায়খানার মধ্যে শুয়ে আছে। চারিদিকে নিজের পায়খানা, নোংরা ছড়ানো।"

তারপর আমাকে নিয়ে গিয়ে পিছন দিক দিয়ে দোকান খুলল। দেখলাম দোকানটাও পরিষ্কার করে রেখেছে।

"নির্মলের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছ?"

"খবর তো দিয়েছি। কেউ আসেনি। কলকাতায়ও খবর পাঠিয়েছি।"

তারপর নির্মলের ওখানে আমার যাওয়া হয়নি। শ্রাদ্ধের পর গেছিলাম। দেখি গোবিন্দ দোকান খুলে বসে আছে। গোবিন্দ নিজেই বলল, "ওরা এসেই প্রথমে বাড়ি ও দোকানের কাগজপত্র খুঁজতে লাগল। ঘরের মধ্যে দুইটা ট্রাঙ্ক খুলে দেখল। কাগজপত্র, টাকা পয়সা কিছু পেল না। দোকানে ঢুকতে চেয়েছিল, তখন আমি বলেছি, দোকানটা নির্মলদা আমাকে দিয়ে গেছে। তখন ওরা খুব রেগে যায়। রেগে গিয়ে পিছনের ঘরগুলোতে দুটো তালা লাগিয়ে

দেয় এবং গৌর ও নিতাইকে বলে যায়—"তোমাদের ঘরে যা ভাড়া হয় রেখে দিও, পরে এসে আমরা নিয়ে যাব, একটা ফয়সালার পর।"

এরপর আর নির্মলের দোকানের ওদিকে যাওয়া হয়নি। কি হল আর জানতে পারিনি।